[৪র্থ গ্রন্থ]

স্বর্ণ-মরু

শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ প্রণীত

[illegible]নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

চৈত্র, ১৩২৩

প্রকাশক—
শ্রীসতীপতি ভট্টাচার্য্য
অন্নদা বুক্ ষ্টল
৭৮।২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

'মানসী' প্রেস
[illegible] বসুর লেন, কলিকাতা
শ্রী[illegible]চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন

বইখানি দেখিয়া তখন কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, এ রকম জটিল বিষয় লইয়া পুস্তক লেখা অন্যায়। কারণ সাহিত্যের অনেক রথী মহারথীই, এই জটিল বিষয়ের হ্যাপায় পড়িয়া ঘোল খাইয়াছেন। আমার উপন্যাসের সূত্রপাত কিন্তু কবির কটি কবিতা লইয়া—কবিতাগুলি যখন সবুজপত্রে প্রথম বাহির হইত, তখন মনের মধ্যে যেন অসহ্য পুলক লাগিত, আমি তাহাই উপন্যাসাকারে রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম; কবির গান লইয়া অনেক চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, কবিতা লইয়াও কি উপন্যাস রচিত হইতে পারে না, এই একটা উত্তেজনা লইয়া—আমার মত অযোগ্যের হাতে যে সে কবিতা "বালনখর ছিন্ন কমলবৎ" দশাপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা সাধুজনমাত্রেই একবাক্যে বলিবেন এবং আমিও কবির চরণে অমার্জ্জনীয় অপরাধে অপরাধী। তথাপিও যে এ রকম ধরণের উপন্যাস প্রকাশে সাহসী হইলাম সে কেবল কয়েকটি সহৃদয় বন্ধুর অনুরোধে—তাঁহারা ভরসা দিলেন যে ইহারও সাহিত্যে দরকার আছে।

এই বুঝিয়া পড়িলে বোধ হয় গ্রন্থকার আসামীর কাঠ-গড়া হইতে অব্যাহতি পাইয়া দর্শকের দলেও একটু স্থান পাইবে। নিবেদনমিতি

১৩২৩ সাল	বিনীত
চৈত্র	গ্রন্থকার



নরেন্দ্র কহিল—"তোমাদের এত ভয় কিসের হিমানী? পুরুষগুলিতো বাঘ নয়।" হিমানী জড়সড় হইয়া ফুলের সাজিটাকে যেন আগলাইবার ছলে দাঁড়াইয়া রহিল।

স্বর্ণমরু

প্রথম পরিচ্ছেদ

গ্রীষ্মের ছুটি হইয়া গিয়াছে, নরেন্দ্রনাথের আজ বাড়ী আসিবার দিন; পিতা রাজশেখর অতি প্রত্যুষেই নদী-তীরে লোক পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, এবং নিজেও সাগ্রহে প্রবাসী পুত্রের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। মাতৃহারা পুত্র; স্নেহের সমস্ত ধারা ঐ এক পুত্রের উপরে পুঞ্জীভূত হইয়াছিল। দাদাঠাকুর রামলোচন চক্রবর্ত্তী তাই আজ ভাল আমল পাইতেছিলেন না। ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার কলিকার আগুন নিভিয়া যাইতেছিল, এবং প্রাত্যহিক প্রভাত-কালীন আসরটা এই ক্ষীণ-তাম্রকূট-ধূমের মত একটা আক্ষেপে মাটি হইবার উপক্রম হইয়াছিল।

রাজশেখরবাবু কিছু চিন্তান্বিতভাবে কহিলেন,—"কাল

সারারাত্রি বৃষ্টি হ'য়ে গেছে, নরেন বাড়ী আস্‌বে,' এখন পর্য্যন্ত কেন আস্‌চে না।"

দাদাঠাকুর শিখা আন্দোলিত করিয়া কহিলেন,—রাজশেখরবাবু, আপনার ধরণই ঐ রকম, ওসব শুভ বিষয়ে মন ভারগ্রস্ত কর্‌তে নেই। আমি বল্‌ছি, এখুনি এলেন বলে, নৌকা বজরার কাজ, হাওয়া না পেলে কি খেয়া এসে সকাল সকাল কূলে পৌছে? অমন কতদিন হয়ে গেছে। আমি যে বেলা পড়্‌লে ঘাটে এসে পৌছিয়েছি।

রাজশেখরবাবু তথাপি চিন্তান্বিতভাবে পাদচারণা করিতে লাগিলেন, কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। দেওয়ালের বড় ক্লক ঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সাড়ে আটটা বাজিয়া গিয়াছে, এমন সময় সর্দ্দার নিধিরাম লাঠি হস্তে নদীতীর হইতে ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল—"দাদাবাবু এবার ছুটিতে বাড়ী আস্‌বেন না"—তাহার চাদরের খুঁট হইতে পত্রখানা খুলিয়া রাজশেখরবাবুর হাতে দিয়া কহিল—"ওপাড়াকার শশী বাড়ী এসেছেন তাঁকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছেন।"

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাজশেখরবাবু পত্র পড়িয়া দেখিলেন, পুত্র যেমন বরাবর লিখিয়া থাকে, পরীক্ষার পড়াশুনার তাড়া ইত্যাদি। পত্রখানা তাকের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন।

দাদাঠাকুর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—"বাপের হৃদয় আর পুত্রের হৃদয় সে কি কখন সমান হয়? পুত্র দিব্য নিশ্চিন্তে কলকাতায় প'ড়ে আছে, আর বুড়ো বাপ্ এখানে সারা হ'য়ে যাচ্ছে।"

রাজশেখরবাবু বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতেই তাঁহার বিধবা ভগিনী প্রসন্নময়ী উৎকণ্ঠিতা হইয়া কহিলেন,—"কি দাদা, নরেনের খবর পাওয়া গেল?"

এই বিধবা পুত্রহীনা প্রসন্নময়ী নরেন্দ্রকে কোলেপিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। রাজশেখর গাঢ়স্বরে কহিলেন—"না প্রসন্ন,সে আস্‌বে কেন? এ বুড়ো বাপ পিসী তার ভাল লাগ্‌বে কেন? আজ যদি থাক্‌তো তার মা—তাহ'লে—"

রাজশেখরের চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল। প্রসন্নও কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিলেন; "না তুমি আজই কলকাতায় যাও, দাদা মাসেক-ছমাসের পর নরেন যদি বাড়ী না

আস্‌বে, তবে আমরা বাঁচবো কি ক'রে। বিয়ে সে এখন হোক না হোক, অন্ততঃ দু'দিন এসে থেকে যাক, সে লিখেছে বুঝি পরীক্ষার তাড়াতাড়ি?" রাজশেখর কহিলেন—"হঁ্যা।"

বাড়ীর মধ্যে যখন হঠাৎ একটা বিষাদ, তখন কেহ লক্ষ্যও করে নাই, একটি উৎকণ্ঠিত বালিকাহৃদয় কিরূপ ক্ষণে ক্ষণে অশ্রুবাষ্পে উদ্বেল হইয়া উঠিতেছিল। সে একবার ছাদের ধারে দাঁড়াইয়া যতদূর দৃষ্টি চলে দেখিতে-ছিল, আকাঙ্ক্ষিতকে খুঁজিয়া না পাইয়া আবার তখনি নিজের ঘরের মধ্যে আপনার খেলার পুতুলগুলির কাছে আসিয়া বসিতেছিল,—কিন্তু আজ আর তাহার ঘর-কন্নার কাজে আদৌ মন বসিতেছিল না—তাহার প্রিয় যে আজ আসিবে বলিয়া আসিতেছিল না—ঘরে কি মন টিকে?

এই বালিকাটিকে ও তাহার মাকে রাজশেখরবাবু তাঁহার মাতুলালয় হইতে আনিয়াছিলেন, স্বজাতীয় ভদ্র-ঘরের কুলবধূ অবস্থা বিপর্য্যয়ে দুর্দ্দশাগ্রস্থা—তাই আপনার ঘরেই আনিয়া রাখিয়াছিলেন, বালিকাটি সুন্দরী বলিয়া প্রসন্নময়ী বলিতেন, ইহার সহিত নরেন্দ্রর বিবাহ দিব।

হিমানীর মা ততটা আশা করিতেন না, কিন্তু সেদিন কর্ত্তার মুখে সে কথা শুনিয়া আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াছেন।

হিমানীও তাহাই জানিত, নরেন্দ্র তাহার প্রিয় আর সে তাহার প্রিয়া—বালিকার মুকুলিত হৃদয়তটের উপর দিয়া ভবিষ্যতের একটা স্বর্ণ-মরীচিকা খেলাইতেছিল। তাই সে যত্ন করিয়া খোঁপা বাঁধিত, চরণে অলক্তক দিত, আর আপনার খেলার পুতুলগুলি লইয়া মাতৃত্বের সাধ পূর্ণ করিত। যোগ্য স্বামীর, যোগ্য-সহধর্ম্মিণী হইবার কতই যে তাহার অভিলাষ, তাহা যাহারাই ধীরভাবে তাহার আচরণ লক্ষ্য করিয়াছে, তাহাদিগকেই বলিতে হইয়াছে, এ মেয়ে যে বংশে যাইবে, সেই বংশেরই কুল উজ্জ্বল হইবে। আজ কোথা হইতে সহসা তাহার প্রিয়-সন্দর্শন-বাসনা বলবতী হইয়া উঠিল। বালিকা তাহার কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারিল না। এক একবার তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, যেন সে ডাক ছাড়িয়া খানিক কাঁদিয়া লয়, ফুকারিয়া বলে, "ওগো এস, আজ যে তোমারই প্রতীক্ষায় ঘরকন্না সাজাইয়া বসিয়া আছি, তুমি নহিলে কি সংসার মানায়?"

ছাদের উপর অনেক কষ্টে ছুটাছুটি করিয়াও যখন তাহার প্রিয়র কোন সন্ধান করিতে পারিল না, তখন সে ক্ষুণ্ণ মনে নীচেই নামিয়া আসিল ; কিন্তু সেখানে আসিয়া শুনিল, সে আসিবে না, একবারে নিশ্চয়ই না—যেটুকুও আশা ছিল, সেটুকুও একটা ফুৎকারে নিবিয়া গেল !

কান্না চাপা তাহার অসাধ্য হইয়া দাঁড়াইল, কিন্তু বাহিরে সে বেশ দেখাইতেছিল, এ বিরহে কোথাও তাহার কিছুই হয় নাই। তাহার কারণ, এখনও ত সে ফুলে ও ফলে নরেন্দ্রের কাছে বন্দিনী হইয়া দাঁড়ায় নাই। তবু রাইমণি ঝি যখন পরিহাস করিয়া কহিল,—"কি দিদিমণি, দাদাবাবু যে এলেন না, কতকাল আর অপেক্ষা করে থাক্‌তে হবে।" তখন সে স্থির থাকিতে পারিল না ; রাগিয়া গাল মন্দ করিয়া রাইমণির চৌদ্দ পুরুষকে নরকের পথে যাইতে বলিয়া আপনার ঘরে কাঁদিতে বসিল। শোক যখন কণ্ঠ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া আসিয়াছে, তখন এই বাহিরের খোঁচাটা কি আরামের ? হিমানী অনেকক্ষণ কাঁদিয়া হৃদয়-ভার অনেকটা লঘু করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। মা সস্নেহে কহিল—"পাগ্‌লী, রাইমণি হেসে কি বলেছে,

তাতে রাগ কর্‌তে আছে ?”—হিমানী আর একবার চোখ মুছিয়া কহিল—“না ওকে তোমরা বাড়ী থেকে দূর করে দাও, এতবড় বজ্জাত !”

এমন সময় রাইমণি কাছে আসিয়া কহিল—“বিয়ে হবে গো দিদিমণি বিয়ে হবে, আচ্ছা বিয়েটা ত হোক তারপর দূর করে দিও ?”

হিমানীর মা কহিলেন—“তোরা সবাই ওই আশীর্ব্বাদ কর মা, হিমানী আমার নরেন্দ্রের হাতেই পড়ুক।”

রাইমণি কহিল—“নিশ্চয় পড়্‌বে। আমাদের কর্ত্তা-বাবুর যে কথা, সেই কাজ।”

রাইমণি চলিয়া যাইতেছিল—হিমানী তাহার মাকে ডাকিয়া কহিল—“মা সেই যে বাসি দইটা আছে, সেটা রাইমণিকে দেবার কথা ছিল না ?—আমি ওর জন্য এত ক’রে মরি—আর—ও কিনা—।”

মা হাসিয়া কহিলেন,—“বটে, বটে মনে পড়িয়ে দিয়েছিস্ বটে।” রাইমণির জন্য দই আনিতে তিনি চলিয়া গেলেন। রাইমণি হিমানীর দিকে একটা কটাক্ষপাত করিয়া ঈষৎ হাসিয়া তারপর গান ধরিল—“সখি আসিবে,

আসিবে গো শ্যাম, গোকুলে ফিরে।" এবার হিমানী এক গাছা ঝাঁটা লইয়া রাইমণিকে তাড়া করিল! রাইমণি তবু গায়িতে ছাড়িল না—হতভাগিনী যেন লাজলজ্জার মাথা খাইয়া এসংসারে ঢুকিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নরেনের সহপাঠী শশিভূষণ আসিয়া যখন নিট্ খবর দিল—যে নরেন এবার আদৌ আসিবে না, উপরন্তু "শুদ্ধি-সভা" বলিয়া এক সভা করিয়া হিন্দুমুসলমান সব একাকার করিবার চেষ্টা করিতেছে, তখন বাধ্য হইয়া রাজশেখর-বাবুকে কলিকাতায় যাত্রার উদ্যোগ করিতে হইল। ভগিনী প্রসন্নময়ী যাত্রার আয়োজন করিয়া দিতে লাগিলেন। নদীপথ দিয়া কলিকাতা যাইতে হইবে। তাই বিশেষ একটা মাঙ্গলিক আয়োজন করিয়া নৌকায় উঠিতে হইল। যাত্রাকালে দাদাঠাকুর রামলোচন চক্রবর্ত্তী স্বস্তি স্বস্তি

বলিয়া আশীর্ব্বাদমন্ত্র পড়িয়া দিলেন, গ্রীষ্মের শীর্ণপ্রায় নদী দিয়া নৌকা চলিতে লাগিল। তীরে দাঁড়াইয়া সতৃষ্ণনয়ন প্রসন্ন বার বার করিয়া দাদাকে বলিয়া দিলেন,—"নরেন যাই বলুক, তার আসা চাই। আর পড়ায় কাজ নাই।"

রাজশেখর "তাহাই হইবে" বলিয়া ভগিনীকে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে আদেশ দিলেন।

প্রসন্ন মাঝি-মাল্লাদিগকে কাল-বৈশাখীর ঝড়ে খুব সাবধানে নৌকা চালাইতে বলিয়া বাড়ী আসিলেন, বাড়ী আসিয়াই কাঁদিতে বসিয়া গেলেন। আজ কত হারাদিনের কত কথা তাঁহার মনে পড়িতেছিল। একবার কাঁদিলেন, ওগো বউ, তুমি কোথায় আছ? বাড়ী ফিরে এস, তোমার অভাবে তোমার পুত্র নরেন্দ্রনাথ বাড়ী আস্‌তে চাচ্ছে না—আমরা তার যত্ন কর্‌তে পারি না—ভালবাস্‌তে পারি না—তুমি এসো। আবার কাঁদিল, মা তুমি কোথায় আছ—তোমার আদরের দুলাল নরেন যে ঘরে আস্‌ছে না—

সমস্ত অতীতস্মৃতি পুঞ্জীভূত হইয়া তাঁহার বক্ষে পাষাণ-ভারের মত বাজিতেছিল। এত সাধের দীর্ঘ-দিবসের

অবসানে নরেন বাড়ীও আসিবে না ?—যে নরেনের জন্য একটি একটি করিয়া দিন গণিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়।

প্রসন্নর ক্রন্দনে হিমানী ও হিমানীর মা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। পদ্মাবতী আসিয়াই প্রসন্নর হাতটি ধরিয়া উঠাইয়া কহিল,—"দিদি, তুমি পাগল হ'লে নাকি ? কর্ত্তা আজ এই বাড়ী হ'তে গেলেন,—আর তুমি কাঁদতে বসে গেলে ?—কার কথায় কি হয় ? এইবার নরেন কেমন আস্‌বে না, দেখো।"

প্রসন্ন হিমানীকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া কহিলেন,—"আস্‌বে, তা বুঝি—কেবল এই জন্যে কাঁদ্‌ছি, আমার বুকটা যেমন কর্‌ছে, নরেনের—কি তার সিকিরও সিকি কর্‌ছে না—আমি এত আয় বাপ্‌ আয় বাপ্‌ ব'লে ডাক্‌ছি—সে কি ক'রে চুপ ক'রে আছে ?"

পদ্মাবতী চক্ষু মুছিয়া ধরা-কণ্ঠে কহিল—" আস্‌বে দিদি,—নিশ্চয়ই আস্‌বে, তুমি তার গর্ভধারিণী মা নাই হও—তবু তার মা বটে, ভগবান্ তোমার চক্ষের জল মোছাবেনই—"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রসন্ন কহিলেন—"কেউ আছে এখানে, একবার ওপাড়ার শশীকে কেউ ডেকে নিয়ে আস্‌তে পারে না? আমি আর একবার ডেকে ভাল ক'রে জিজ্ঞাসা করি"—এমন সময় রাইমণি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইতেই তাহাকে কহিলেন—"যা' দেখি রাইমণি—ওপাড়ার শশীকে একবার ডেকে নিয়ে আয় দেখি—আমি তাকে নরেনের কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বো।" রাইমণিও তাহাই চায়—নরেনের সম্বন্ধে সমস্ত কথাটা পরিষ্কার করিয়া শুনিয়া দশজনের কাছে বিশদ করিয়া বলিতে পারে।

রাইমণি মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া চলিয়া গেল।

পদ্মাবতী কহিলেন,-"এস দিদি, নাওসে, অনেক বেলা হ'য়ে গেছে—"

প্রসন্ন কহিলেন—"নাইবো এখন, বলি শোন দেখি, নরেন যদি না আসে তবে কি ক'রে বাঁচবো আমি?—খেতে শুতে বস্‌তে হা নরেন জো নরেন ছাড়া আমার কিছু নেই। মালা নিয়ে কেষ্টনাম জপ্‌ কর্‌তে গেলে—নরেন নাম বেরিয়ে পড়ে—শুতে গেলে স্বপ্নে নরেন ছাড়া কিছুই নেই—নরেনের বিয়ে—নরেনের সংসার—নরেনের বউ—"

পদ্মাবতী ঈষৎ হাসিয়া কহিল—"নরেনের বউ ত তোমার কোলেই রয়েছে দিদি—"

প্রসন্ন কহিলেন—"হাঁ সেই জন্যেই ত একে এত ভাল লাগে—বিয়ে হয় নি এখনও, তবু মনে হয় এই আমার নরেনের বউ।"

এবার হিমানী অনেকখানি চঞ্চল হইয়া উঠিল। পদ্মাবতী কহিলেন—"হিমানী, শুন্‌ছিস্ ত, এমন পিসা-মার যত্ন আত্তি কর্‌তে পার্‌বি ত? তা পার্‌বে, হিমু আমার তেমন মেয়ে নয়—ও শাশুড়ীকে শ্বশুরকে কেমন ভক্তি কর্‌তে হয়—তা জানে—"

হিমানী "যাও" বলিয়া একটা লজ্জার হাসি হাসিয়া মায়ের কোলে মুখ লুকাইল।

প্রসন্ন আবার হিমানীকে টানিয়া লইয়া আপনার কোলে বসাইয়া কহিলেন,—"তা আমাদের যত্ন আত্তি কর্‌তে পারুক আর নাই পারুক, নরেনকে পার্‌লেই হ'লো—ওদের সুখেই আমার সুখ—আর কদিনই বা আছি—তোমরা পাঁচজনে বলো যে ওদের কোলেই আমরা ভাই-বোনে চলে যেতে পারি—"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এমন সময় রাইমণির সহিত শশিভূষণ আসিয়া উপস্থিত হইল। শশী আসিতেই পদ্মাবতী একটু ঘোমটা টানিয়া একখানা কার্পেটের আসন পাতিয়া দিয়া একটু অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইল। কারণ সে যে ভাবী জামাই নরেনের সহপাঠী, তাহাকে সমীহ ত দরকার।

প্রসন্ন প্রথমে অভ্যর্থনা পরে শারীরিক কুশল লইয়া তৎপরে কহিলেন—"বল্ দেখি বাবা, কি ব্যাপারটা—সত্যি বল্‌বি। সত্যই কি নরেন হিন্দু মোসলমানে মুদ্দফরাশে, একাকার কর্‌বার মতলবে আছে ?"

শশী হাসিয়া কহিল—"কে ব'ল্‌লে ? এতটা নয়,—তবে হাঁ, এক জায়গায় ব'সে হিন্দুদের মধ্যেই ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য এদের নিয়ে যে খাওয়া যেতে পারে এটা সে ব'লেছে বটে, খেয়েছে যে তাও নয়!—"

একটা আশ্বাসসূচক দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া প্রসন্ন কহিলেন —"আঃ বাঁচালি বাবা, মাথার চুল যত তত তোমার প্রমাই হো'ক। লোকে কত কথাই না বল্‌ছে। কেউ বল্‌ছে খৃষ্টান হয়েছে, কেউ বল্‌ছে বেহ্ম হয়েছে, মাগো পোড়ালোক কতই কথা রটাতে পারে—"

রাইমণির দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন—"ও রাইমণি আমরা যেমন জগন্নাথক্ষেত্রে গিয়ে সব একজায়গায় এক পাতে খাই না—নরেন আমার তেম্নি কথাই ব'লেছে, তাওসে খায়ও নাই"—শশীর দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন—"আর ত কিছু নয়—"

শশী কহিল—"আর কিছু না—নরেনদা বাড়ী আস্‌বে নিশ্চয়, এলেই সব শুন্‌তে পাবেন।"

প্রসন্নময়ী কহিলেন,—"সে ত পাবোই বাবা, তুমিও ত আর মিথ্যে বলে যাচ্ছো না"—হিমানীর মার দিকে চাহিয়া কহিলেন—"শশিভূষণের জলখাবারের জায়গা করে দাও।"

শশী আপত্তি তুলিল, কহিল—"জল যে এইমাত্র খেয়ে এলাম পিসিমা—"

প্রসন্ন কহিলেন—"সে যাই খেয়ে আসো বাবা—তুমি আমায় সংবাদ শুনিয়েছ, মিষ্টি মুখ না করিয়ে ত ছাড়্‌ছি না—ঘরে তেমন বেশী কিছু নাইও, নরেন আস্‌বে ব'লেই নারকোল দিয়ে ছানা দিয়ে বরফী ক'রে রেখেছিলাম—ওই টুকু মুখে দাও।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এমন সময় পদ্মাবতী খুব খানিকটা ঘোমটা দিয়া একটা রেকাবিতে গোটাকয়েক মিষ্টান্ন ও এক গ্লাস জল আনিয়া দিল।

শশিভূষণ কি ক'রে, অগত্যা তাহাকে বসিয়াই খাইতে হইল।

পিসিমা তারপর আনন্দ-উদ্বেলিত হৃদয়ে হিমানীকে বক্ষে চাপিয়া কহিলেন—"শশী দেখ্‌ছো, এইটিই তোমার নরেনদার বউ হবে। কেমন বউ—তোমাদের সব পছন্দ হবে ত?"

হিমানী লজ্জায় মুখ ফিরাইল।

শশী কহিল—"বেশ দিব্যি মেয়েটি ত? পছন্দ হবে না কেন?—বেশ খাসা—"

শশিভূষণ হঠাৎ বিষম খাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। "পিসি-মা কহিলেন,—"ষাট্ ষাট্ কে নাম ক'চ্ছে—ভুঁইয়ে এক কণা সন্দেশ ফেলে দাও দিকি—বিষম রাক্ষসী আর বিষম কর্‌তে পার্‌বে না—"

শশিভূষণ হাসিয়া কহিল—"সে আবার কি পিসিমা? বিষম রাক্ষসী আবার কে?"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া রাজশেখরবাবু একেবারে নরেন্দ্রের বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলেন না ; বড়বাজারে তাঁহার গ্রামের নবীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে ঘিআটার দোকান ছিল, সেইখানে গিয়া উঠিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, এখানে দেশের অনেকের সমাগম হয় এবং অনেক ঘটনার আলোচনাও এখানে হইয়া থাকে।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কোন গতিকে তৈলাক্ত কাষ্ঠাসনের উপর একটু স্থান করিয়া দিয়া গ্রামের জমিদার রাজ্-শেখরবাবুর অভ্যর্থনা করিলেন।

রাজশেখরবাবু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে একটি প্রণাম ঠুকিয়া ব্যবসায়ের সম্বন্ধে, দেশের চাষ আবাদ সম্বন্ধে কয়েকটি সাবেক বয়েৎ আওড়াইয়া তার পর আপনার ব্যক্তব্যটিকে খাড়া করিলেন।

সদ্য জল-ফিরান হুকার কতকটা জল মাটিতে ফেলিয়া রাজশেখরবাবু কহিলেন, "তাহ'লে আপনি কিছু শুনেছেন কি বাঁড়ুয্যেমশায় নরেন সম্বন্ধে ? সে ত বাড়ী যেতে চায়

না, একরকম সেই কারণেই আমাকে এখানে আসতে হয়েছে।"

বাঁড়ুয্যেমশায় চোক ঈসারা করিয়া ডাকিয়া (ভাবটা এখানে লোক সমাগমের সম্ভাবনা আছে) গুদামের এক অন্ধকার ঘরে উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—"হাঁ শুনছি ত রাজশেখরবাবু, কথাটাও ভাল নয়—আমি একদিন মাধববাবুর বাজারের ওখানে তাগাদায় গিয়েছিলাম, হর-দত্ত রাও ঝুনঝুন্-ওয়ালার সঙ্গে আমার কারবার আছে কি না?—সামান্যই পাওনা ছিল—১০০০৲ হাজার কি দেড়হাজার মোটের মাথায় ঠিক আমার মনে হচ্ছে না।"

রাজশেখরবাবু কহিলেন, সে যাই হোক, মনে করো দু'হাজারই যেন হ'লো—তুমি মাধববাবুর বাজারের ওখানে গিয়েছিলে তার পর?"

বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পর বোসেদের শশীকে ত জানেন?

রাজশেখর। জানি বৈকি।

বন্দ্যোপাধ্যায়। শশীই আমায় ডেকে নিয়ে গেল। বলে দাদাঠাকুর দেখ, হিন্দুয়ানী নরেনদা আর রাখলে

না,—আর আমায়ও তার ওপর আপনি নজর রাখ্‌বার কথা ব'লেছিলেন, তা সাত ঝঞ্ঝাটে পেরে উঠ্‌তে পারিনে, নানাকাজে জড়িয়ে পড়্‌তে হ'য়েছে"—

রাজশেখর। সে ত বুঝতেই পারা যাচ্ছে।

বন্দ্যোপাধ্যায়। অজ্ঞে হঁা—বাসাটা কাছেই ব'লে গেলাম—আমি যেতেই নরেনবাবু ভারি অপ্রতিভ হ'য়ে গেলেন। ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখি মুচি, ফিরিঙ্গি, মোসলমান, কোন জাত আর বাদ নেই। সবাই ব'সে রয়েছে, পোলাও কাবাবের গন্ধ তখনও ভুরভুর কর্‌চে—যদিও কখনও ওসব খাই নি, তবু গন্ধটা পেলে জিনিষটা মালুম কর্‌তে পারি—টেবিলের ওপরে তখনও দু'খান' ডিস্‌ মাংস সমেত প'ড়ে রয়েছে, আমার আর কিছুই বুঝতে বাকী রইল না।"

রাজশেখরবাবু তামাক টানিতে টানিতে কহিলেন, "তুমি তাই দেখে কিছু বল্লে না?"

নবীন কহিলেন, "বল্লাম বৈকি, তাদের সাম্‌নে কি আর বল্‌বো বলুন—বাইরে ডেকে নিয়ে এসে বল্লাম, কি ব্যাপার?" নরেন মাথা চুলকতে চুলকতে বল্লে—ইংরে-

জীতে আমি ফার্ষ্ট হয়েছিলাম ব'লে আজ এরা ধরেছে, তাই খাওয়ালাম—"আমি দেখ্‌লাম গোপনে গোপনে এতে তত দোষ নেই, বল্লাম বাবা, এরকম ক'রে বাপের পয়সা অপব্যয় করো না।"

রাজশেখরবাবু হুকা নামাইয়া কহিলেন, "মদ-টদ ধরে নি ত ?"

বন্দ্যোপাধ্যায় চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন "রাম রাম মহাভারত। তামাক পান পর্য্যন্ত নরেনকে কেউ খেতে দেখে নাই, সে সব ভাবনা ক'রবেন না, ছেলে খুব ভালো, তবে ঐ কেলাস্ ফ্রেণ্ডদের সামলাতে পারে না, এই যা, দু'দিন পরে সব শুধ্‌রে যাবে।"

রাজশেখরবাবু আস্তে আস্তে বাহিরে আসিয়া কহিলেন, "আমি এখনই নরেনের ওখানে যাবো এক খানা গাড়ী ডাকিয়ে দাও।"

বন্দ্যোপাধ্যায় কহিলেন, "তাহ'লে এবেলাটীও এখানে থাক্‌বেন না ?"

রাজশেখরবাবু কহিলেন,—"না, পারি ত ফির্‌তি মুখে তোমাদের এধার হয়ে যাব।"

গাড়ী আসিতেই তৎক্ষণাৎ তিনি গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলেন। চীৎপুর রোড যেখানে পার হইতে হইবে সেখানে গাড়ী ঘোড়া ও ট্রামের ভয়ানক ভিড় লাগিয়া গিয়াছিল। এই কারণে অনেকক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করিতে হইল।

এই সুযোগ খবরের কাগজের ফিরিওয়ালারা কিছুতে ছাড়িতেছিল না—গাড়ীর আরোহী দেখিলেই খবরের কাগজ লইয়া উপস্থিত হইতেছিল—এবং নানরূপ বাক্য-জাল ছড়াইয়া কাগজ বিক্রয় করিতেছিল। রাজশেখরবাবুকে একখানা লইতে হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়—তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন তাহার পরিবর্ত্তে আসিল—জীবন-প্রভাত!

কাগজ খুলিতেই দেখিলেন—বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে, "একেশ্বরবাদীদের মহাসম্মিলন" গত শনিবার বাগানে ভোজ ও বক্তৃতা হইয়া গিয়াছে।

সাবধানের সহিত সমস্তটা পড়িয়া দেখিলেন, পুত্র নরেন্দ্রনাথও এ দলের একজন পাণ্ডা বটে।

আর একবার চোক বুলাইয়া সমস্তটা পড়িয়া মনে

মনে কহিলেন, "বাঙ্গলার জাতীয়তা"—বাঙ্গলার জাতীয়তাতে আমাদের কি লাভ ?

তিন নম্বরে গাড়ী পৌঁছিতেই গাড়োয়ানকে ভাড়ার টাকা দিয়ে, ঘন-পদ-বিক্ষেপে উপরে উঠিয়া তিনি ডাকিলেন "নরেন্দ্র ! নরেন ! নরেন !"

এ কণ্ঠধ্বনি অনেকদিন এ কক্ষে প্রতিধ্বনিত হয় নাই।

নরেন্দ্র সবে এইমাত্র রমাকান্তকে বিদায় দিয়া বাঙ্গলার জাতীয়তা সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিল, ভেদ-প্রথা রহিত না হইলে যে একটা জাতি গঠিত হইবে না—এ ধারণাটা নরেন্দ্রের মস্তিষ্কে বেশ গাঢ়তররূপে মুদ্রিত হইয়াছিল এবং এদেশে জাতিভেদ রহিত করাও যে কত বড় দুঃসাহসিকতা, তাহাও ভাবিয়া দেখিতেছিল।

এমন সময়ে আবার উচ্চকণ্ঠে শব্দ হইল—নরেন্দ্র ! নরেন !"

নরেন্দ্র তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখিল,—"পিতা রাজশেখর—"

অবনত হইয়া প্রণাম করিবার পূর্ব্বেই পিতা তাড়া-

তাড়ি কাগজখানা নরেন্দ্রের সম্মুখে মেলিয়া ধরিয়া কহিলেন, —"এ সব কি শুনছি নরেন্দ্রনাথ? তুমি বাঙ্গলার জাতি-গঠন কর্‌তে চলেছ,আর নিজের কত হারাচ্চো, তা বুঝ্‌তে পারনি? আমি তো বৃদ্ধ পিতা।" বলিতে বলিতে রাজ-শেখরবাবুর স্বর কম্পিত ও রুদ্ধ হইয়া আসিল, তিনি আবার কহিলেন,—"যে পিতা একরকম তোরি মুখের দিকে চেয়ে এ সংসারে আছে, সেই পিতার ধর্ম্ম পরি-ত্যাগ করে ম্লেচ্ছধর্ম্মে দীক্ষা নেবার মতলব করেছিস— লেখাপড়ার গৌরবে মনে করেছিস্ বুড়োদেরও ছাড়িয়ে উঠেছিস্, তা যতই ওঠ্ এ প্রচীনরাও নিতান্ত ক্ষুদ্র ধর্ম্মের ছায়ায় থাকে না।"

নরেন্দ্র তাড়াতাড়ি কহিল, "বাবা মনেও ভাববেন না, আমরা আর্য্য-সমাজী কিম্বা খৃষ্টান হচ্ছি, তা যদি শুনে থাকেন, তা হ'লে ভুল শুনেছেন, তবে এইটা মাত্র জান্‌বেন যে, শরীর রুগ্ন হ'লে তার অনেকগুলো পথ্যের পরিবর্ত্তন কর্‌বার আবশ্যক হয়।"

রাজশেখরবাবু কাগজখানা ছুঁড়িয়া দিয়া কহিলেন, "এই কি পরিবর্ত্তন না পরিবর্জ্জন? নরেন তর্ক করে

ভুলিয়ে রাখিস্ আর কাউকে, কিন্তু আমায় পারবি না! একাকার আর কাকে বলে?"

নরেন্দ্র দেখিল পিতার রোষ ক্রমেই সংযমের সীমা অতিক্রম করিয়া উঠিতেছে, একটু সান্ত্বনা দেওয়া কর্ত্তব্য! দুটো মিষ্ট বিশেষণ যোগ করিয়া কহিল,—"বাবা দুইটী কলেজের খৃষ্টান বন্ধুকে বাসায় নিজের টেবিলে খাওয়ানকে যদি জাত খোয়ানো বলেন, তাহ'লে কলেজে পড়া চলে না, সেখানে যে ছত্রিস জাত নিয়ে কারবার কর্‌তে হয়।

রাজশেখরবাবু কহিলেন, "সে আমি জানি, কিন্তু তাহারও বড় কথা শুনতে পাই, শু'ন তুই নাকি, দলের একজন মস্ত পাণ্ডা।"

নরেন্দ্র হাসিয়া কহিল, ভুল শুনেছেন।"

রাজকিশোর কহিলেন, "সত্যি ভুল?"

নরেন্দ্র। আজ্ঞা হাঁ।

"তবে বাড়ী চল্, যদি সত্যই তোর জাত গিয়ে থাকে, তবে আবার হারা জাত পাল্টে দেবো। পাঁচজনাকার কথা আমার সহ্য হয় না। আমরা যতদিন আছি,

ততদিন আমাদের ধর্ম্ম মেনে চলিস্, তার পর আমরা ম'রে গেলে যা রুচি হয় গ্রহণ করিস্।"

নরেন্দ্র এবার সমস্যায় পড়িল, এই ছুটিতে কত স্থানে তাহার মেলামেশা ও ঘুরিবার সঙ্কল্প ছিল, পিতা যদি বাড়ী টানিয়া লইয়া যান, তাহা হইলে সমস্তই যে মাটী হইয়া যাইবে! বেহারাকে পিতার জন্য, পান জল আনিতে বলিয়া এবং তাঁহাকে ঘরে বসাইয়া চট করিয়া বন্ধু রমা-কান্তর সহিত একবার দেখা করিতে চলিয়া গেল।

রমাকান্ত কহিল, এত তাড়াতাড়ি যে?"

নরেন্দ্র পিতার আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া কহিল, "পিতা তাহাকে এখন শুধু ধমকাইতেই আসেন নাই, গ্রেপ্তাতারও করিতে আসিয়াছেন। সেই সঙ্গে বিশ্বাসঘাতক শশীর কথাও বলিতে বাদ পড়িল না, শশীই যে এত-খানি করিয়া তিল্‌কে তাল করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।"

রমাকান্ত কহিল, নিশ্চেষ্ট প্রকৃতির লোকের সহিত আমাদের কোন কালেই সংস্রব নেই। আমরা প্রাণের বাজার খুলেছি, যার প্রাণ আছে, সেই আমাদের

আনন্দবাজারে আসবে। যারা আসবে না, তাদের আমরা গালমন্দও দেব না, তাদের ঠাট্টাও গায়ে মাখব না।"

নরেন্দ্র কহিল, "সে যাই হোক, বাবা যে এসেছেন, আমার যাওয়া উচিত কি না? আমি সেই মতলবটা তোমার কাছে নিতে এলাম।"

"আমরা কাজ করবো বলে যে বাপমায়ের মনে কষ্ট দেব বা বাড়ী যাব না, এমন ত কোন কথা নেই, নিশ্চয় যাবে।

"আমাদের কাজ?"

"শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর ফিরে এসে, আমাদের কাজে আবার লেগে পড়্‌বে।"

"আমার কিন্তু ভাই ঠিক ইচ্ছাটা নেই। বাড়ী গেলেই কেমন প্রাণটা হাঁপিয়ে ওঠে, তার কারণ সেখানে ত আর কিছু নেই, কুয়ার জল আর পুকুরের পাঁক।"

রমাকান্ত হাসিয়া কহিল, "সেই জন্যেই ত তোমায় এত ভাল লাগে নরেন্দ্র এমন মুক্ত প্রাণের পূর্ণ খবর এ পর্য্যন্ত খুঁজে পেলেম না। সত্য বটে আমরা যা

করছি, তা ছেলে খেলা কি আর যাই হোক, কিন্তু আমাদের ত তা উদ্দেশ্য নয়, আমরা চলেছি প্রাণের আনন্দে, নিশ্চেষ্ট নির্জীবগুলাকে একবার জাগিয়ে দিয়ে বলবো তোরা ওঠ্, প্রাণের বাজারটাকে একবার চিনে নে, জগতে আনন্দের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে, তোরা কেন বাকী থাকিস্। সেইজন্য আমাদের মন্ত্র হচ্ছে আনন্দ, আনন্দ ভাই আনন্দ জীবন। নিজেদের প্রাণের সাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে আর পাঁচটা প্রাণের অনুরণনা বেজে উঠুক, যেমন সারঙ্গীর সুপ্ত তারগুলো একটা বড তারের কাঁপনে কেঁপে ওঠে।"

নরেন্দ্র কহিল, "তা কাঁপাব ভাই, নইলে কি এতদূর পর্য্যন্ত ছুটে আসতাম? নিশ্চয়ই আমাদের এই স্বেচ্ছা-চারিতায় তাঁদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের আঘাত পড়েছে।"

রমাকান্ত দেরাজ হইতে একখানা বই টানিয়া নরেন্দ্রের হাতে দিয়া কহিল, "বাড়ীতে অবসর কালে এই বইখানা পড়্তে থাকবে, এর মধ্যে প্রাণের বীজমন্ত্র আছে, এখন এস।"

নরেন্দ্র বই খুলিয়া কহিল, "এ যে সবুজপত্রের সব গান।"

"হাঁ বীজমন্ত্র না থাকলে দিতাম না, বিশেষ স্থলগুলায় দাগ দেওয়া আছে।"

নরেন্দ্র কহিল, "এই যে দেখ্‌ছি—

বিবাগী কর্ অবাধপানে পথ কেটে যাই
অজানাদের দেশে—"

চমৎকার মন্ত্র।

রমাকান্ত কহিল, "হাঁ কেবলই জপ কর।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পথে আসিতে আসিতে নরেন্দ্রনাথের শঙ্কা হইয়াছিল, তাহাকে আবার কোন রকম প্রায়শ্চিত্তের পাকে হয় ত পড়িতে হইবে। কিন্তু বাড়ী পৌঁছিয়া সেরূপ আয়োজন দেখা গেল না, পিতার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের সম্মুখে কথা কয়

এ রকম লোক খুব কমই ছিল। যেই নরেন্দ্রের ব্যাপার শুনিল, সেই এটা ছেলেমানুষী বলিয়া উড়াইয়া দিল।"

শুধু পিসিমার হস্তে যা-কিছু পড়িতে হইল। পিসিমা নিত্য নিত্য আজ কালাচাঁদের মহাপ্রসাদ কাল পীরের সিন্নী, আজ দিদি ঠাকুরুণের স্নান জল—কাল দাদাঠাকুরের চরণ-রেণু এই সব লইয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন—বাড়ীর মধ্যে পূজা ও স্বস্ত্যয়নের বিরাম নাই। ষোল আনা করিয়া যে কত দেবতার পূজা হইল তাহার আর লেখা-জোখা নাই।

নরেন্দ্র ছেলেবেলা হইতে এই সমস্ত ছেলে মানুষীর চক্ষে দেখিত এবং পূর্ব্বে যেরূপ সুগভীর অবজ্ঞার সহিত হোমযজ্ঞের প্রসাদ গ্রহণ করিত, এবারও সুধু স্নেহময়ী পিসিমার খাতিরে সেই ভাবেই গ্রহণ করিল।

পিসিমা কহিলেন, "বাবা, খেলিরে বিশ্বেশ্বরের প্রসাদ ?"

নরেন্দ্র অমনি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "খেলাম বৈ কি পিসিমা প্রসাদ না খেলে বিশ্বেশ্বরের চেলারা আমার ঘাড় ভেঙ্গে নেবে তাকি জানি না পিসিমা ?" পিসিমা কহিলেন

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

"ঠাকুর দেবতাকে উপহাস করিস্‌নে বাবা, উপহাস করিস্‌নে, কখন যে দেবতার কৃপা হয় তা কি কেউ জান্‌তে পারে? দিনমানের মধ্যে ৪৯টা ক্ষণ, সেই ক্ষণে ক্ষণে দেবতারা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, উপহাস কর্‌বার কি যো আছে?"

নরেন্দ্রের সব অপরাধ নিজের শিরেই চাপাইয়া লইয়া পিসিমা নকুলেশ্বর ও বিশ্বেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলেন, "বাবা দেবতারা, আমার নরেন ছেলে মানুষ কিছু জানে না, আমি আবার জোড়া পাঁটা চিনির নৈবেদ্য দিয়ে তোমাদের পূজা দেব।"

কিন্তু ব্রাহ্মণ-ভোজনের দিন নরেন্দ্র আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিল না; সেইদিন পিসিমা যখন সমবেত ব্রাহ্মণের রদরজ রৌপ্যপাত্রে করিয়া নরেন্দ্রের মুখের কাছে ধরিলেন, নরেন্দ্র সেটা ফেলিয়া দিয়া কহিল, "তোমার স্নেহের খাতিরে অনেক ইট পাথরেরও প্রসাদ মাথায় পেতে নিয়েছি, কিন্তু এই সমস্ত ব্রাহ্মণের পদরজঃ নির্ব্বিকারে মাথায় পেতে নিতে পারি না; যদি মানুষের প্রতিই ভালবাসা শেখাও, তবে নিয়ে এস তোমার বাড়ীর চাকর চাকরাণীর পদরজঃ,

নইলে জোর করে এই সমস্ত ব্রাহ্মণের পদরজঃ,যারা শ্রেয়োলাভের খাতিরেই তোমার দ্বারে অতিথি হয়েছে; আমি তাদের পদরজঃ গ্রহণ কর্‌তে পারি না---”

পিসিমা আঁচলের অগ্রভাগ দিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পদরজঃ কুড়াইতে কুড়াইতে কাঁদ কাঁদ স্বরে কহিলেন, “তুই কি নিজের অকল্যাণ ছাড়া কর্‌বি না নরেন? এ পদরজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মাথায় ক’রে নিয়ে ছিলেন। আর তুই?” তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

নরেন্দ্র কহিল, “সে ত্যাগী, উদার, মহৎ ব্রাহ্মণের কাছে মাথা আপনি লুটিয়ে পড়ে পিসিমা,—কোন আয়োজন কর্‌তে হয় না—বা শিষ্যের দোহাই দিয়ে অজ্ঞ দেশবাসীদের কাছ হ’তে ভক্তি ও ভোজন আদায় কর্‌বারও দরকার হয় না।”

পিসিমা নরেনের কথার কোন উত্তরমাত্র না দিয়া কাঁদ কাঁদস্বরে কহিতে লাগিলেন,—“হে ভগবান্ রক্ষা কর, আমার নরেন কিছুই জানে না, তাকে তোমার অবোধ বালকটি বলে ক্ষমা কর।” বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্র পিসিমার দিকে চাহিয়া ভাবিল, কি করুণ এই দৃশ্য! নিজের হিতাহিত চিন্তা করিবার সামর্থ্যটুকু পর্য্যন্ত লোপ পাইয়া গিয়াছে, কোন একটা প্রশ্ন করিবারও সে শক্তি নাই। কেবল শুনিতেছেন, আকাশ জুড়িয়া এই শব্দ স্পন্দিত হইতেছে, "তোমরা মূঢ়, তোমরা জড়, কিছু জান না, নির্ব্বিকারে ব্রাহ্মণের শাস্ত্রের মুখে আপনাকে বিসর্জ্জন দাও, পরকালে অনন্ত স্বর্গ লাভ!"

ভাবিতে ভাবিতে তাহার মাথা গরম হইয়া উঠিল—চটিটা পায়ে দিয়া ফট্ ফট্ করিয়া নীচে পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিল,—"বাবা, আপনি যাদুকরের মায়ামন্ত্রে মুগ্ধ হ'য়ে আছেন।"

পিতা অবাক্ হইয়া নরেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"কে যাদুকর নরেন্দ্র?"

নরেন্দ্র কহিল, "যারা আপনাকে স্বর্গের লোভ দেখিয়ে ভুলিয়ে রেখেছে, আপনার বিবেককে শুদ্ধ পঙ্গু করেছে, বৈশাখী ব্রতের ফর্দ্দ ফেঁদে নিজেদের চর্ব্ব্য, চোষ্য এবং সেই সঙ্গে আপনার মস্তকটি শুদ্ধ চর্ব্বণ কর্‌বার সুযোগ করে

নিয়েছে। যারা যথার্থ উপবাসী, অনাথ, তারা আর্ত্তনাদ করে ফিরে যাচ্ছে, আর আপনি—”

রাজশেখর বাবু হাসিয়া কহিলেন,—“ওরে অবোধ বালক, ব্রাহ্মণ-ভোজনের তুল্য ফল আর আছে? ব্রাহ্মণ হলেন্ সাক্ষাৎ নারায়ণের অংশ, তাঁদের সম্বন্ধে কোন কথা মুখে আনিস্ না। এ সব যুক্তি তোকে দিল কে?”

নরেন্দ্র কহিল,—“বাবা আপনিই আপনার মনে একটু চিন্তা করুন না, এরাই কেবল কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট চিহ্নিত ব্যক্তি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের অংশ, আর অনাথ ভিক্ষুক-গণ, যাদের পরিশ্রম অপহরণ করেই ওদের জন্য আয়োজন কর্‌তে পেরেছেন—তারা ঈশ্বরের কেউই নয়?”

এমন সময় অদূরে দাদাঠাকুর রামলোচন চক্রবর্ত্তী লুচির ধামা স্কন্ধে সেদিক দিয়া আসিতেছিলেন, রাজশেখর বাবু নরেন্দ্রকে একটা কৃত্রিম ধমক দিয়া কহিলেন,—“যা যা তোর জ্যাঠামিতে কাজ নেই। তোর যখন ঘরকন্না হবে, তখন যা বুঝ্‌বি তাই করিস্। এখন আমরা যা করে যাই তাই মেনে যা—”

নরেন্দ্র কম্পিতকণ্ঠে কহিল,—“বাবা ভ্রান্ত বিশ্বাস

ত্যাগ করুন, ওসব যাদুকরের দল, তারা 'অত্যাচারের লাঠিটাকেই ধর্ম্মের নামে গিল্‌টী' করে সমাজে ধর্ম্মধ্বজীর আসন গ্রহণ কর্‌তে চায়!" বলিয়া সে চলিয়া গেল।

বামলোচন নরেন্দ্রনাথকে ভয় করিত। দূব হইতে তাহার কতকগুলা কথাও শুনিয়াছিলেন; এখন রাজশেখব বাবুর সম্মুখে আসিয়া কহিলেন—কি ব'লছিলেন নরেনবাবু? বুঝি আমাদেরই কথা? তা আমাদের উপর চট্‌লে উপায় কি; এ যে শাস্ত্রেব বিধান, আমরা ত ইচ্ছা করে আইন করি নি যে ব্রাহ্মণকে তোমাদের ভোজন করাতে হবে. কি পূজা কর্‌তে হবে।"

বাজশেখর বাবু কহিলেন,—"কি বল্‌ছেন দাদাঠাকুব। নরেন্দ্র ছেলেমানুষ, ওর কথাটা কি ধর্ত্তব্যের মধ্যে?"

ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণের অভিশাপের ঝাঁঝটা কল্পনা করিয়া রাজশেখর বাবু শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিলেন।

চক্রবর্ত্তী লুচির ধামাটা দাওয়ায় নামাইয়া কহিলেন "রাজশেখরবাবু, বলেন কি? আমি ঘরের ব্রাহ্মণ আপনাদের সাতপুরুষ আমাদের পায়ের ধুলায় ধন্য হয়েছে। এত

ধনদৌলত সে ত ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদের জোরে, আর সেই বংশের কুলতিলক কিনা—?"

রাজশেখর বাবু বাধা দিয়া কহিলেন, "মাপ কর দাদাঠাকুর, নরেন না ভক্তি করুক, আমি ত রয়েছি।"

চক্রবর্ত্তী তাড়াতাড়ি কহিল,—"আমি ত সেজন্যে কিছু ব'লছি না রাজশেখর বাবু, আর এ পরগণের এমন ব্রাহ্মণ কেউ নেই যে, আপনাদের বংশধরকে একটা কথাও বল্‌বে, তবে এটা দোষের কি না তাই দুকথা ব'ল্‌ছি।"

চক্রবর্ত্তী বেশ বুঝিতেছিলেন, কর্ত্তা যতদিন জীবিত আছেন,—তার পর ব্রাহ্মণের প্রবেশাধিকারই হয় ত এ বাড়ীতে থাকিবে না, এবং নিত্য পূজাও উঠিয়া যাইবে।

নরেন্দ্র সেদিন আর একেবারেই বাড়ীতে তিষ্টিতে পারিল না, দূরের বাগানবাড়ীতে রমাকান্তপ্রদত্ত সেই বইখানা লইয়া পড়িতে বসিল।

সেই বহিতে অগ্নি ছড়ান ছিল। খানিক পড়িয়া আর পড়া হইল না। দেশের এই বর্ত্তমান দুর্গতিটার দিকে চাহিয়া তাহার সমাজবোধ উদ্‌বুদ্ধ হইয়া উঠিল। এত বড় একটা দেশ দিন দিন ধর্ম্মের নামে কতকগুলা অধর্ম্মকেই

বরণ করিয়া দিব্য নিশ্চিন্তে নিদ্রা দিতেছে, তাকে জাগা-ইবার, তাকে চেতনা দিবার শক্তি কাহারও কি নাই ?

নরেন্দ্র ঘরের বাহির হইয়া আসিল। ছোট ফুলের গাছগুলার কাছ দিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে কহিল, এ কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের ভার আমাকেই নিতে হবে। কেউ সঙ্গে না আসে একলাই অগ্রসর হ'তে হবে। আমার দীন দরিদ্র দেশবাসীদের ডেকে বলতে হবে। 'তুমি অজর —তুমি অশোক—তুমি অভয়—তুমি অমৃত। তুমি ব্রহ্মণ্য পীড়িত—মূঢ়ই নও। তোমার শক্তি আছে, সাহস আছে, সত্যকে পাইবার অধিকারও তোমার আছে।"

আরও কত কথা তাহার চিত্তের উপর উদ্বেল-কুহক তুলিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল। এমন সময় সহসা একটা মৃদু-বলয়ের মধুর নিক্কণ শব্দ তাহার কাণের কাছে যেন বসন্ত তালে বাজিয়া উঠিল।

নরেন্দ্র ভাবিল, নিশ্চয় কোন অপরিচিতা, পুষ্প তুলি-বার উদ্দেশে গোপনে তাহার সঙ্গী সাথী লইয়া এই সন্ধ্যা-সমাগমে আসিতেছে।

কিন্তু শব্দটা যেন কেমন পরিচিত বলিয়া মনে হইতে

লাগিল। যেন অনেকবার এই পদধ্বনি সে শুনিয়াছে, শুধু চিনিয়া রাখিতে পারে নাই।

নরেন্দ্র একটু উন্মুখ হইয়া চাহিতেই দেখিল, হিমানী ও পাড়ার আর কয়েকটি মেয়ে স্ফুটনোন্মুখ কয়েকটা গন্ধরাজ ফুলের গাছের পাশে নরেন্দ্রকে দেখিয়া লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে।

নরেন্দ্র সেখান হইতে উঠিয়া পড়িল। কিন্তু একটি বালিকা কোন গতিকে লাজলজ্জার মাথা খাইয়া নরেন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া বলিল,—"বাড়ীতে ডেকে পাঠিয়েছে এখুনি আপনাকে যেতে. হবে," বলিয়া সে ছুটিয়া অদৃশ্য হইল। পশ্চাৎ হিমানী ও আর সকলে চলিয়া গেল।

নরেন্দ্র কাহাকে একটা প্রশ্ন করিবারও অবসর পাইল না। অথচ ডাক যে তাহার পড়িয়াছে এটা সে বুঝিল। হিমানীরও এতটা লজ্জা অন্যবারে ছিল না, আসন্ন-বিবাহ সম্ভাবনায় তাহার মধ্যে একটা অপরূপ ভাব কি প্রবল ভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে! নরেন্দ্রের চিন্তাক্লিষ্ট চিত্তের উপর দিয়া নারীরূপের এক বিচিত্র মাধুরী ফুটিয়া উঠিল। চেষ্টা করিয়াও সে স্মৃতির হাত সে এড়াইতে পারিল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সকাল বেলা যখন নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিল, তখন নরেন্দ্রের নানা চিন্তাভারাক্রান্ত মনের মধ্যে কাহার এক-খানি পুষ্পপেলব মুখ জাগিয়া উঠিল।

নরেন্দ্র দেখিল, তাহার জীবনপ্রভাতের পুরোভাগে সেই ত রূপসী! সেই ত কল্যাণী! তাহাকে তাহার ভুলিবার উপায় কোথায়?

উঠিয়া বাহিরে আসিতেই আবার শুনিল, তাহাদেরই কণ্ঠস্বর। গত দিনে যাহার কণ্ঠস্বরে একবার সে চকিত হইয়া উঠিয়াছিল, দেখিল সেই হিমানী, আর হিমানীর সঙ্গে সেই মেয়েরা—দল বাঁধিয়া ফুল তুলিতেছিল। নরেন্দ্র তাহাদের সম্মুখীন হইতেই প্রায় সকলেই পলাইয়া গেল, রহিল কেবল হিমানী আর তার সই। নরেন্দ্র বিনা কারণে ডাকিল, হিমানি! এ আহ্বানে হিমানীর সইও পলাইয়া গেল। হিমানীও যে না পলাইতে পারিত তাহা নহে, কেবল নরেন্দ্রের অবাধ্য হইবার ভয়ে কোন রকমে

পলাইতে পলাইতেও বহিয়া গেল। কি মনে করিবেন নরেনবাবু? সে আর ত ছেলে মানুষটি নাই।

অনবরত বাহিরের উত্তাপে তাহার অপরিস্ফুট কুমারী-জীবনেই ভাবী সংসারের উজ্জ্বল চিত্র চিত্রিত হইয়া উঠিয়াছিল। স্বামী জিনিষটি কি, এবং কতখানি, তাহাকে ভয় ও ভক্তি করিতে হয়, তাহাও সে বুঝিয়াছিল, তা ছাড়া নরেন্দ্রের রূপও ছিল জগত আলো করা, বিদ্যাবুদ্ধিও কম নহে, এই সব কারণে বিবাহের পূর্ব্বেই নরেন্দ্রের পরে তাহার হৃদয়ের সমস্ত আশা প্রীতি, ভক্তি ও প্রেমে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল—

অবনতমুখেই সে দাঁড়াইয়া রহিল।

নরেন্দ্র কহিল—"তোমাদের এত ভয় কিসের হিমানী? পুরুষগুলিতো বাঘ নয়।"

হিমানী জড়সড় হইয়া ফুলের সাজিটাকে যেন আগলাইবার ছলেই দাঁড়াইয়া রহিল!

নরেন্দ্র কহিল—"এত ফুল তোমরা রোজ সকালে তোল? হিমানী কষ্টে একটা "হাঁ" উত্তর দিল।

নরেন্দ্র কহিল—"এতফুল দিয়ে কি করো?"

হিমানী নতমুখে কহিল, "ঠাকুর পূজো।"

নরেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "কি ঠাকুর, শুনি?"

হিমানী কিছুতে নাম বলিতে রাজী হইল না। ভাবিল এখনি কি ভুল ধরিয়া বসিবে।

নরেন্দ্র তাহার অঞ্চলের রিংটা টানিয়া কহিল—"এখন একথা না ব'ল্লে বিয়ে হ'লে তোমাকেও আমি কোন কথা বল্‌ব না।" হিমানী ভাবিল, একি অন্যায় জুলুম, সে-ই না হয় না বুঝিয়া তাহার সর্ব্বস্ব এই দেবতাটির পায়ে সমর্পণ করিয়াছে; তাই বলিয়া দেবতার এত অত্যাচার কেন? কোন রকমে চোককাণ বুজিয়া কহিল—"শিবঠাকুর।"

নরেন্দ্র কহিল, "শিবঠাকুর, যে ঠাকুর শ্মশানে ঘোরে, আচ্ছা কি ব'লে পূজা কর শুনি—"

হিমানী ঘাড় নাড়িয়া কহিল—"না মন্তর কাউকে বল্‌তে নাই।"

নরেন্দ্র কহিল—"আমি বুঝি তোমার আর কেউ? বিয়ের মন্ত্রটাও না হয় না পড়া হ'য়েছে, নইলে বিয়ে ত হ'য়ে গেছে।" এই বলিয়া শক্ত করিয়া হিমানীর হাতটা চাপিয়া ধরিল,—"যেন সে এই কুসুমসুকুমার বালিকার

স্পর্শে মধুর একটা উন্মাদনার পুলকে অসম্বৃত হইয়া উঠিয়াছিল।

হিমানী নতমুখে কহিল—"উঃ লাগ্‌চে, আমি আর একদিনও ত ফুল তুল্‌তে আস্‌বো না। বলিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া ছাড়াইবার চেষ্টা করিল। তাহার চিত্তে তখন সই ও ক্ষীরোদার কথা জাগিতেছিল—যদি তাহারা গোপনে দেখিতে পায় তাহা হইলে ত আস্ত রাখিবে না!—কোন রকমে পলাইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

বাহিরে আসিতেই ক্ষীরোদা হো হো করিয়া হাসিয়া কহিল—"আমি সব দেখে ফেলেছি, সব্বাইকেই বল্‌বো?"

হিমানী কাঁদ কাঁদ হইয়া কহিল,—"কি দেখেছিস্ বল্ না শুনি!"

ক্ষীরোদা কহিল—"কি আর, নরেনবাবু তোর চুমু খাচ্ছিল না!—"

হিমানী কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল,—"ঈস্‌ তা বই কি, কখনও না, তোর সব মিথ্যা কথা, এত বড় মিথ্যা কথা বলিস্‌নে ভাই।"

নরেন্দ্র দূর হইতে এ দৃশ্য দেখিতেছিল, দেখিতেছিল,

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হিমানীকে তাহার সঙ্গীরা বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে।

সে সরিয়া আসিয়া কহিল,—তোমার কাঁদবার দরকার নাই হিমানী, আমি সবাইকে বল্‌বো এই ফুল আর ফুলের মত, হিমানীকে আমি ভালবাসি, এবং এমনই বিয়ের পরও ভালবাসবো।—ক্ষীরোদাও লজ্জা ও ভয়ে এতটুকু হইয়া গেল।

তাহারা চলিয়া যাইতে নরেন্দ্র ঝাউতলার বেদির ধারে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। এতদিন যে ভাবনা কদাচিৎ করিয়াছে, সেইটা প্রভাতের আলোকের মত ধীরে ধীরে তাহার সমস্ত হৃদয়াকাশটা জুড়িয়া বসিল!

ভাবিল, তাই ত কৌতুকচ্ছলে এক কথা বলিতে যাইয়া এ কি বলিয়া ফেলিলাম, এর পর যদি পিতারও অমত হয়, তবু আমার হিমানীকে গ্রহণ করিতেই হইবে। তবে একদিন বিবাহ করিবে না বলিয়া বন্ধুদের কাছে সে যে একটা স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়াছিল, সেটা মনে পড়িয়া তাহার ভারি লজ্জা হইতে লাগিল।

বন্ধু রমাকান্তকে সব কথা জানাইয়া একখানা পত্র

লিখিবে মনে করিয়া সে উঠিয়া গেল! রমাকান্তর কাছে সব আছে—মার্জ্জনাও আছে, শাস্তিও আছে, আবার বিধি-নিষেধ করিবারও অপূর্ব্বশক্তিও তাহার মধ্যে আছে, যাহা শ্রেয়, তাহাই গ্রহণ করিতে সে বলিবে।

নরেন্দ্র প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া রমাকান্তকে চিঠি লিখিতে বসিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ছুটি ফুরাইয়া আসিতে আর দু পাঁচদিনমাত্র বাকী আছে। এমন সময় কলিকাতা হইতে রমাকান্তর পত্রের উত্তর আসিল।

পত্রে নরেন্দ্রনাথ তাহার বর্ত্তমান জীবনের সমস্ত ঘটনাই আনুপূর্ব্বিক খুলিয়া লিখিয়াছিল, রমাকান্ত তাই সে পত্রের এমন উত্তর লিখিল যে, সে পত্রে নরেন্দ্র একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। "বিবাহ ও ভোগসুখ জীবনের চরম লক্ষ্য

নয়" এইটেই বার বার করিয়া সে নরেন্দ্রকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছে, আরও লিখিয়াছে, যদি বিবাহই করিতে হয়, তবে সাধারণের মত বিবাহ আমাদের চলিবে না, আমাদের বিবাহেও সমাজে, একটা নূতন যুগের সূচনা করিবে।

নরেন্দ্র মাঝে দিনকতক, যে একটা মায়া মরীচিকার পানে তাকাইয়া আলস্যে ও ঔদাসীন্যে নিতান্ত সাধারণের মত দিন কাটাইতেছিল, তাহার জন্য ভারি অনুতপ্ত হইয়া উঠিল।

সমস্তটা সুদে আসলে শোধ তুলিতে একবারে তৎ-ক্ষণাৎ পিতার কাছে উপস্থিত হইয়া কলিকাতা-যাত্রার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল।

পিতা কহিলেন, "আর তোমার পড়াইতে ইচ্ছা নাই। এখন আমি ইচ্ছা করি যে, তুমি কিছু কিছু বিষয় কর্ম্ম দেখ, আমার একা দ্বারা সব দিক সাম্‌লানো অসাধ্য হ'য়ে উঠেছে।"

নরেন্দ্র একবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। ইহা সে কল্পনাও করে নাই। একবারে পড়া বন্ধ!

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিল, "তা হ'লে

কি আপনি ইচ্ছা করেন, এই ক'টা মাসের জন্য এগ্‌জামিনে ফেল হবো ?

রাজশেখরবাবু গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন,—"হঁা আমার যখন তাই ইচ্ছা তখন আপাততঃ তাই বিবেচনা করতে হবে বৈকি !" রাজশেখরবাবু আর কিছু বলিলেন না, কিন্তু ভাবে বোঝা গেল, তিনি অনেকখানিই চাপিয়া গেছেন।

নরেন্দ্র আর সেখানে দাঁড়াইল না—বুঝিল যে তাহার সম্বন্ধে পিতা অনেকখানি মস্তিষ্কই ঘামাইয়াছেন এবং শেষে সংসারের ঘানিগাছে জুড়িয়া দিয়া তাহাকে পরম নিশ্চেষ্ট ভারবাহি-বলীবর্দ্দের মত বাঁধিয়া রাখিতে স্থির সঙ্কল্প হইয়াছেন।

এখন হইতে সে শুধু ক্ষুধা পাইলে খাইবে, নিদ্রা আসিলে শয়ন করিবে, আর পুত্রের পিতা হইবে, এবং সেই পুত্রেরা পিতৃপুরুষের পিণ্ড রক্ষা করিবে।

নরেন্দ্র এই ভাবি সংসারবন্ধনের দিকে চাহিয়া একবারে শিহরিয়া উঠিল ; উচ্চকণ্ঠে কহিল, "না, কখনই না—কূপ-মণ্ডুকের মত দু পাঁচকাঠা জমি জায়গা লইয়া আমার

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কিছুতেই চলিবে না, "আরোর" দিকে যার গতি, অনন্ত জগতসংসারের সহিত যাহার ঘরকন্না পাতাইবার আয়োজন, সে এই ক্ষুদ্র কোটরটুকু লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না—একেবারেই না—"এই কথা ভাবিতে ভাবিতে তৎক্ষণাৎ সে উঠিয়া আপনার ঘরে গিয়া রমাকান্তকে এক পত্র লিখিতে বসিল। লিখিল—

"রমাকান্ত,

বুদ্ধিমানের দল বাধা দিচ্চেন, তা দিক, আমি তা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনি না; প্রাণের ভিতরে মহাপ্রাণের ডাক পেয়েছি; আমি এখন তোমার কবির কথায় 'দুরন্ত' একবারে অবাধপানের বিবাগী, এখনও যে শান্ত শিষ্টটি রয়েছি, সে কেবল খানিকটা মায়া নিতান্ত জড়িয়ে ধ'রে আছে ব'লে, কিন্তু কৌশলের ত্রুটি রাখছি না। এদিকে গুজব আমার বিবাহ না দিইয়ে আর বাড়ী হ'তে পাঠাবে না!—ভাই পত্রপাঠ তুমি, শিকল ছেঁড়ার একমন্ত্র আমায় পাঠিও।

পত্রখানা ডাকে পাঠাইয়া দিয়া বাহির হইবামাত্র দেখিল একি ব্যাপার? চার পাঁচজন বাড়ীর ও পাড়ার

ঝি চাকরে মিলিয়া থান কয়েক খঞ্চিপোষ ঢাকা সন্দেশের থালা, প্রকাণ্ড এক ট্রেতে কাপড় চোপড় লইয়া তাহার ঘরের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইল। পশ্চাতে পিসিমাও সহাস্যমুখে আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

পিসিমাকে দেখিয়াই নরেন্দ্র বলিয়া উঠিল—"এ সব কি ব্যাপার পিসিমা ?"

পিসিমা কহিলেন,—"তোমার হবো শ্বশুরেরা পাণপত্র পাঠিয়েছে বাবা।"

বাড়ীর সকল চাকরেরা মিলিয়া তথন নরেন্দ্রের কাছে বক্‌শিশের প্রার্থনা করিতে লাগিল—পিসিমা কহিলেন, "তোরা ত ঘরের চাকর-বাকর বক্‌শিশ পাবি তার আর কি ?" তার মধ্যে একজন পুরাতন সর্দ্দার ভৃত্য সে কহিল— "সে হবে না পিসিমা, এতো আর আপনাদের জিনিষ নয় যে যখন খুসি আমাদের দাম চুকোবেন। আমাদের দাদাবাবুর শাশুড়ী নিজে পাঠিয়েছেন, আমাদের বক্‌শিশ আমরাও ছাড়বো না, আমরা কর্ত্তাবাবুর কাছ থেকেই আদায় করবো।"

পিসিমা কহিলেন—"তাই যা—"

নরেন্দ্র কহিল,—"সত্যই পিসিমা, তিনি এ সমস্ত নিজের পয়সা ভেঙ্গেই পাঠিয়েছেন ?"

পিসিমা কহিলেন,—হাঁ বাবা আমি বল্লুম, দরকার কি ? আশীর্ব্বাদ করো যেন নরেন বেঁচে থাকে, তোমার শ্বাশুড়ী তাতে কাঁদতে কাঁদতে বল্লেন, 'গরীব হ'য়েছি বলেই কি জামাইয়ের সাধআহ্লাদ করবো না ?" কাজেই আমরা আর বাধা দিতে পার্‌লাম না।

নরেন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া কহিল,—"তাই ধ'রে বেঁধে আগেই বুঝি এসব পাঠিয়েন, তা এ এক রকম মন্দ নয়, জামাইটি হাতছাড়া হবার বড় ভয় থাকে না, কি জানি বাজার দরও এবেলা ওবেলা বদল হয়।"

পিসিমা কহিলেন—"বলিস্ কিরে, বাজারে কেনা বেচার মধ্যেও তুই না কি ? ছেলের বিয়েতে যে টাকা নেয় নিক্‌গে, আমরা তা পার্ত্তাম না, আমি যেদিন হ'তে শুনেছি বিয়েতে টাকা নিলে ছেলে বেচা হয়, সেই দিন হ'তে ও মতলব ত্যাগ ক'রেছি, আমাদের দরকার ভাল একটি টুক্‌টুকে মেয়ে, তাও পেয়েছি, আর কি চাই !"

নরেন্দ্র কহিল,—তা হ'লে পিসিমা, তুমি ওসমস্ত

যেখানে রাখ্‌বে রেখে দাও, আমি এখন একবার বাইরে বেরুব।"

তাহার পিসিমার কাছে কিছু টাকা লইবার দরকার ছিল তাহা আর হইল না।

পিসিমা কহিলেন,—"তোর শ্বশুর বাড়ীর দুটো সন্দেশ খেয়ে মিষ্টিমুখ ক'রে গেলিনেরে?"

নরেন্দ্র কহিল,—"সন্ধ্যার পর খাব।"

নরেন্দ্র চলিয়া যাইতে তাহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী পদ্মাবতী কন্যা হিমানীকে সঙ্গে লইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পদ্মাবতী আসিয়াই কহিলেন,—"কি হ'লো, ছেলের পছন্দ হ'লো না বুঝি?"

প্রসন্ন কহিলেন, "ও আমার তেমন ছেলে নয়। এত দিয়েছ দেখে বল্লে তাঁর এ সব এখন থেকে পাঠাবার কি দরকার ছিল? আবার একটু ঠাট্টাও করেছিল।"

পদ্মাবতী আনন্দ ও আবেগে কয়েক বিন্দু চক্ষের জল মুছিয়া কহিলেন—"আমার হিমানীর যে এমন বরের সঙ্গে বিয়ে হবার কথাবার্ত্তা হবে তা স্বপ্নেও ভাবি নাই। হিমানী

কত জন্ম তপস্যা ক'রেছিল, তাই”—আর বলিতে পারিলেন না, আবেগে কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল।

হিমানীও আবেগকম্পিত ছল ছল নেত্রে মায়ের অশ্রুটা মুছাইয়া দিয়া পিসিমার কাযে সাহায্য করিতে লাগিল।

যতদূর তাহার সাধ্যে কুলায় তাহার দ্বিগুণ প্রয়াসে বালিকা ঘরের সমস্ত দ্রব্য ঝাড়িতে ও সাজাইতে লাগিল, সে জানে আর দুইদিন পরে ত এই ঘর তাহারই হইবে। এখন হইতে যদি ভাল করিয়া না সাজায়, তখন কত খোঁটাই না জানি সহ্য করিতে হইবে। 'তিনি' হয় ত আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিবেন, “এই ত তোমার কাজ।” তখন সে কি লজ্জা!

আলমারীর দেরাজটা উবুড় হইয়া পরিষ্কার করিতেছে, এমন সময় তাহার সঙ্গিনী ক্ষীরোদা আসিয়া কহিল,—“কিরে বরের ঘরকন্না নিয়ে তোর একদণ্ড বিরাম নাই যে—”

পিসিমা যে ঘরে রহিয়াছেন, তাহাতে একটু সমীহাও করিল না, হিমানী চোখ টিপিয়া ইসারা করিল, ক্ষীরোদা

তাহা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিল না। আবল তাবল যাহা মনে আসিতে লাগিল বলিতে লাগিল।

হিমানী দৃঢ়স্বরে কহিল—"এইবার ক্ষীরি তোর সঙ্গে নিশ্চয় জন্মের মত আড়ি কর্‌বো!"

ক্ষীরোদা কহিল,—তাই কর না, আমার সঙ্গে ত দুনিয়ায় সবাই আড়ি করেছে; তুই ক'র্‌লে তাতে কি ব'য়ে যাবে, আর দুদিন পরে তুই বড় মানুষের ঘরণী—গৃহিণী হবি, আমরা ত দূর থেকে চেয়ে দেখে চলে যাবো।" বলিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

পদ্মাবতী উপরে আসিয়া কহিল,—"ও কিছু জানে না মা, ওর কথায় কি রাগ ক'রতে আছে? তোমাদের চাইতে ও অনেক ছোট, ছোট বোনটার মতই ওকে দেখো।

পিসিমা কহিলেন,—"তা ব'লো না বেহান, ঐ ক্ষীরি মেয়েটি কম নয়! তুই বাপু পাঁচ বৎসরে বিধবা হয়েছিস্ এই সব মেয়েদের সঙ্গে তোর এত মেশামিশি কেন? হিমানী ত বেশী ওকে কিছুই বলেনি, ওই কতকগুলো শুনিয়ে দিয়ে গেল।"

ক্ষীরোদার ইচ্ছা করিতে লাগিল পিসিমার টুঁটিটা গিয়া

সে চাপিয়া ধরিয়া তার পর চলিয়া যায়। বিধবা হইয়াছে বলিয়া সে জগতের এত অবজ্ঞার পাত্র? সমবয়সী সঙ্গিনীদের সহিতও একটা কথা কহিতে পাইবে না?

ক্রুদ্ধা বাঘিনীর মত একটা তীব্র জ্বালাময় কটাক্ষ পাত করিয়া ক্ষীরোদা সেখান হইতে চলিয়া গেল, যাইবার সময় বলিয়া গেল, "আর আসিব না গো, জন্মেও এদিক্ মাড়াইব না।"

পিসিমা কহিলেন—"তা আসিস্ না বাছা, তুই যে ধার দিয়ে আনাগোনা কর্‌বি, সেই ধারই জ্বলে যাবে।" পদ্মাবতীকে পিসিমা সাবধান করিয়া দিয়া কহিলেন,—"আর হিমানীও যেন ক্ষীরোদার সহিত না মেশে। কারণ তাব গুরুজনের প্রতি না আছে আস্থা, না আছে শ্রদ্ধা, না আছে সম্মান ভক্তি।"

হিমানী কহিল,—"না পিসিমা, আর ওর সঙ্গে মিশ্‌ব না।"

আসলে ক্ষীরি কিন্তু আসিয়াছিল—ভাল মনটি লইয়া হিমানীর বরের পানপত্র দেখিতে, আর একটু আমোদ করিতে, কিন্তু বিধি যে তার প্রতি সদাই বাম, যাইবার

সময় সে গেল একটা গণ্ডগোল করিয়া ও দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া—

তাহার কারণও ছিল, সে ছিল নিতান্ত বালবিধবা, আর তার প্রাণটা ছিল আশায় ভরা, কোথাও শাঁক বাজিলে গাত্র হরিদ্রার উলুধ্বনি উঠিলে সে ছুটিয়া সকলের অগ্রবর্ত্তী হইত। সে নিজেও ভাবিত, আর তাহার আত্মীয়েরাও মনে করিত এই রকম দশজনাকার দেখিতে দেখিতে নিজের দুঃখ ভুলিয়া যাইবে; কিন্তু তাহার শিক্ষা ছিল অন্য রকমের আর সে সঙ্গিনীদের কাছে স্বামি-সম্বন্ধের কথাবার্ত্তাও শুনিত অন্য ধরণের।

এই কারণে জীবনের প্রথম উন্মেষ প্রভাতে যেখানে তার সংযমপূত ব্রহ্মচারিণী হইবার কথা, সেখানে সে কামনার লোল প্রোজ্জল বহ্নিশিখাটির মত দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। দাহ নিবারণ করিতে যাইয়া দ্বিগুণ দাহকেই বরণ করিয়া লইতে লাগিল। দিবানিশি তাহার চোখের উপরে দৃশ্য-জগতের আনন্দ-কোলাহল-বিজড়িত স্বামি-পুত্র, সংসারের মরীচিকাটা স্বপ্নের মতই লাগিয়া আছে; যেখানেই সে ব্যথা জুড়াইতে যায়, সেখান হইতেই

দ্বিগুণ ব্যথা বুকে লইয়া ফিরিয়া আইসে ; এত বড় বিশ্ব-সংসারে সে যেন একটা রাহু, একটা দুষ্ট গ্রহ। তাহার এ জীবন-জোড়া অন্ধকারের পারে আলোর একটা ক্ষীণ রেখাও নাই। শুদ্ধ বিষাদের অন্ধকারে ছায়াতলেই তাহার আশাভরসা বিসর্জ্জন দিয়া চলিতে হইবে। ক্ষীরোদা সৃষ্টির পরম নিষ্করুণতার দিকে চাহিয়া কাঁদিতেও পারিল না, শুধু চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রমাকান্তের পত্রের উত্তর প্রাপ্তি পর্য্যন্ত অপেক্ষা, নরেন্দ্রের সহিল না, সে কলিকাতা যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিল।

রমাকান্ত যে লিখিয়াছিল—আমাদের বিবাহ সাধারণের মত হইবে না, সমাজে তাহাতেও একটা নূতন স্রোত বহিবে, সেই কথাটারই চরম কিছু শুনিবার জন্য তাহার

আশু কলিকাতা যাইবাব আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল, কারণ হিমানীর সহিত তাহার বিবাহের মোটেই আর বিলম্ব ছিল না, জ্যৈষ্ঠটা পার হইয়া আষাঢ়ের প্রথমেই হউক কি শেষেই হউক, হইবেই। তাই পূর্ব্বেই রমাকান্তেব কাছে বিবাহ সম্বন্ধের ব্যাপারটা কি তাহা জানিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। ভগবান্ প্রজাপতির ইচ্ছা ত ব্যর্থ হইবে না।

কলিকাতা যাওয়া সম্বন্ধে পিতার অনুমতি প্রাপ্তি বিষয়ে সন্দিহান হইয়া পিসিমার কাছেই এবার কিছু অর্থের জন্য ধরিল।

পিসিমা কহিলেন,—যখন শুভ বিবাহের কথা বার্ত্তাটি পাকাপাকিই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তখন বিবাহের পর যাওয়াই ভাল নয় কি ?

নরেন্দ্র কহিল,—বিবাহ যখন হইবেই পিসিমা, তখন তোমরা আমার ক'লকাতা যাওয়ায় বাধা দিচ্চো কেন ? আষাঢ় মাসে না হয় শ্রাবণ ভাদ্র কার্ত্তিক, সাম্‌নে ঢের মাস প'ড়ে আছে।

পিসিমা হাসিয়া কহিলেন—হ্যাঁরে পাগল, ভাদ্র আশ্বিন মাসে কি বিয়ে হয় ?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্র কহিল—কেন হয় না? সে মাসগুলো তোমাদের কাছে কি অপরাধ করেছে। তারপর অতিমাত্র ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া কহিল—ভাদ্র আশ্বিনে না হয় পিসিমা—চৈত্র বৈশাখেই হবে, তুমি কিন্তু এখন আমায় টাকা দাও।

পিসিমা নরেন্দ্রের কথার রকম শুনিয়া না হাসিয়া পারিলেন না, ভাবিলেন নরেন আমার চিরকাল এমনি সরল আপন ভোলাই রহিল। লেখাপড়া শিখিয়া কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। তিনি হাসিয়া কহিলেন,—বাবা তুই যে হিন্দু, মুসলমান কি খ্রীষ্টান তা কিছুই বোঝবার যো নাই! তা যাই হোস্ বাবা ভগবানের দয়ায় বেঁচে থাকিস্।

নরেন্দ্র কহিল,—সে জন্য তোমার কিছু ভাবনা নাই পিসিমা। তোমার গঙ্গাযাত্রায়—সে আমিই চারপায়া আন্‌বো। এখন আসল কথাটি চাপা দিচ্চো কেন বাপু?

পিসিমা কহিলেন—সত্যি বাপু, আমার টাকা কড়ি নেই, আর থাক্‌লেও, তোমার বাপের অমতে তা দিতে পারি না।

নরেন্দ্র কহিল—পিসিমা তুমি এ ভাল কচ্চো না, আমি তোমার কাছে একেবারেই চাচ্চি নে, ধারস্বরূপই চাইছি, তাও যদি না দাও, তা হ'লেও আমি কলকাতা যাবো, কিন্তু তোমাদের বিয়ের সময় কে আসে তাই দেখা যাবে।

নরেন্দ্র জানিত এ কথায় পিসিমা মোটে স্থির থাকিতে পারিবেন না, তাই একটু জোর দিয়াই কহিল,—তোমরা এখন সামান্য দু একশোর জন্য কাতর হ'চ্চো। তখন হাজার হাজার খরচ করতে হবে।

পিসিমা খানিক গম্ভীর হইয়া থাকিয়া তারপর দুই চোখে আতঙ্কব্যগ্র এক চাহনি চাহিয়া কহিলেন,—তা'হলে সত্যই পালাবি; হাঁরে—কিন্তু টাকা পেলে ঘরে আসবি ত?

নরেন্দ্র কহিল,—যে দিন হুকুম করবে।

পিসিমা কহিলেন,—তোরি মানসিকের জন্য এক শত টাকা তুলে রেখেছিলাম, দাদা ঠাকুর বলেছিল, একটা ভক্তি যসা যাগ করতে হবে, তাতে তোর হিন্দুয়ানীতে মতি বাড়বে, সে যসা যজ্ঞ পরে হবে অখন, তুই কলকাতা থেকে ঘরে ফিরে আয় তার পর যা হয় হবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্র কহিল,—সোজা কথায় দিলেই ত হতো পিসিমা।

তাহার কলিকাতা যাত্রার আয়োজন বাড়ীর আর কেহ জানিল না, জানিল কেবল পিসিমা, আর পদ্মাবতী।

পদ্মাবতী কহিলেন,—বাবা বিবাহের সময় ত বিলম্ব করবে না?

নরেন্দ্র বলিল,—না, বিবাহের দিন স্থির শুন্‌লেই চলে আস্‌বো—

পদ্মাবতী কহিলেন,—তোমারই ভরসায় আমরা দিন কাটাচ্চি, দেখো বাবা, শেষকালে আশায় যেন নৈরাশ্য হ'তে না হয়।

নরেন্দ্র কহিল,—কোন ভাবনা নাই।

ভোরের বেলায় নরেন্দ্রনাথ যখন নদীতীরে উপস্থিত হইল, তখন দেখিল ঘাটে গ্রামের আর কেহ তখন উঠিয়া আইসে নাই, শুধু পাষাণ ঘাটের রাণায় দাঁড়াইয়া বিধবা ক্ষীরোদা, হাতে ফুলের সাজি, সঙ্গে একটি সাথীও নাই।

ক্ষীরোদাকে একাকিনী দেখিয়া নরেন্দ্র কহিল—তুমি একলা ঘাটে কেন ক্ষীরোদা—

ক্ষীরোদা কহিল,—একলা ছাড়া দোক্‌লা ত আমাব নেই।

নরেন্দ্র জানিত ক্ষীবোদা একটু মুখরা, তাই আব বেশী প্রশ্ন না করিয়া কহিল,—দেখ আসবাব সময় পিসিমাব সঙ্গে দেখা করে আসা হয়নি, পিসিমাকে ব'লো ভাবনাব কারণ নেই, আমি কলকাতা পৌছিয়েই তাঁকে পত্র দেবো।

ক্ষীবোদা কহিল,—আপনি আর কাউকে বরং একথাটা বলে যান—

নবেন্দ্র কহিল,—কেন?

ক্ষীরোদা কহিল,—আমার আপনাদের বাড়ী যাবাব পর্য্যন্ত হুকুম নেই।

নবেন্দ্র কহিল,—কেন?

"কেন? কেন আমি বিধবা,—আমার যে দৃষ্টিতে বিষ আছে, আমার যে নিঃশ্বাসে বিষ আছে, সেদিন স্পষ্টই আপনার পিসিমা বল্লেন, তুমি ক্ষীরোদা আর আমাদেব বাড়ী এসো না, হিমানী ছেলে মানুষ, তোমার সঙ্গে থাকলে সেও জ্বলে যাবে।" স্পষ্ট নির্ব্বিকার ভাবে ক্ষীরোদা এই কথাগুলা বলিয়া গেল।

নরেন্দ্র কহিল,—বিধবা হ'লেই বিষ-কন্যা ব'লে দেখ্‌তে হবে তার ত কোন সঙ্গত কারণ নেই।

ক্ষীরোদা কহিল,—কিছুই কারণ নেই ঐটেই যে মস্ত কারণ। নইলে বাস্তবিক আমার কোন দোষ দেওয়ার কারণ নেই, আর আমি নষ্টও নই, দুষ্টও নই!

নরেন্দ্র কহিল,—আমার কথায় তুমি যেয়ো—

ক্ষীরোদা কহিল,—না তা বলবেন না বাবু, আমায় বরং আপনার সঙ্গে যেতে বলুন তা পার্‌বো, কি জলে ঝাঁপ দিতে বলুন তাও পারবো, তবু একবার যেখান থেকে কুকুরের মত তাড়া খেয়েছি, সেখানে আর যেতে পার্‌বো না।

নরেন্দ্র কহিল,—আচ্ছা তোমার কোন কথা বলেই কাজ নেই।

নৌকা ছাড়িয়া দিল; নৌকায় বসিয়া যতক্ষণ দৃষ্টি চলে ততক্ষণ নরেন্দ্র তীরের ঐ অভাগিনী বিধবার দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর ভাবিতে লাগিল, হায়! একদিন সত্যই তাহার সবই ছিল, আর আজ লোকসমাজ তাহাকে বিধবা সাজাইয়াছে, তাহার সমস্ত জীবনটাই এখন মরু, একবারে

অনুর্ব্বর ধূ-ধূ বালু প্রান্তর—মানুষ তাহাকে কি অধিকারে মানুষের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিল? নরেন্দ্র আপনাকে প্রশ্ন করিয়া ইহার কোন সঙ্গত উত্তর খুঁজিয়া পাইল না। ঠিক করিল বন্ধু রমাকান্তের সহিত এই বিধবাদের লইয়া কিছু আলোচনা করিতে হইবে। নৌকা চলিতে লাগিল।

প্রভাতে যখন অন্যান্য বালিকারা ফুল তুলিতে আসিল, ক্ষীরোদা তখন আপনার ফুল তুলিয়া ঘাটে পূজাও সারিয়া ফেলিয়াছে। অন্যান্য দিন সে তাহার আর আর সঙ্গিনীদের জন্য অপেক্ষা করিত। আজ আর অপেক্ষামাত্র সহে নাই।

মাটির ঠাকুর বিসর্জ্জন দিয়া সে উঠিয়া পড়িল, উঠিয়াই দেখিল হিমানী। হিমানীকে দেখিয়াই সে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু নরেন্দ্রের কথাটা মনে পড়িয়া যাওয়ায় কহিল, শোন্ হিমানি—

হিমানী কহিল,—কি?

ক্ষীরোদা কহিল,—তোদের বাড়ীতে বলিস্, নরেন্দ্র বাবু কলকাতা চলে গেল, আমায় বলেছিল বল্‌তে—আমি ত আর তোদের ওখানে যাই না, তা দ্যাখ আবার ফিরে

আস্‌বে তোর সঙ্গে বিয়েও হবে। আমায় ব'লতে ব'লে-ছিল তাই বল্লুম—ভাবিস্‌নে এ মিথ্যা—সত্যই—

হিমানী কহিল,—আচ্ছা বলব।

রাইমণি ঝি সে সময় এধার দিয়া যাইতেছিল, কথাটার খানিকটা শুনিয়া কহিল,—দাদাবাবু কোথায় গেলেন? কলকাতা, কই আমরা ত শুনিনি, তাঁর যে বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেছে। আর কলকাতার নাম শুনলেই যেন গা-টা কাঁটা দিয়ে দিয়ে ওঠে। ক্ষীরোদা মনে মনে কহিল, বেশ হয়, নরেন আর কলকাতা থেকে ফিরে না আসে বেশ হয়; হিমানীর কত সুখ একবার দেখি—বড় দেমাক তবু এখনও বিয়ে হয়নি—না আসে হে হরি, বলিয়া সে চলিয়া গেল। ঈর্ষ্যায় সে ফাটিয়া মরিতেছিল, কারণ মানুষ জোর করিয়া তার সব রাস্তাগুলাই বন্ধ করিয়া দিয়াছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কলিকাতা পৌছিয়াই নরেন্দ্র আপনার বাসায় না গিয়া একেবারে রমাকান্তের বাড়ীতেই গিয়া উঠিল—কহিল,

রমাকান্ত ব্যাপার কি, প্রতি পত্রেই যে বিবাহ আর ভোগ সুখই জীবনের কর্তব্য নহে বলিয়া পত্র লেখা হইতেছিল।

—রমাকান্ত কহিল—লেখা হ'চ্ছিল তার কারণ ছিল—রোগ যেখানে বিষম, সেখানে বিষম ঔষধেরই ব্যবস্থা করতে হয়—

নরেন্দ্র কহিল,—রোগটা বুঝি আমার সেই ভাবি বালিকা বধূটি—কেমন?—তা অসম্ভবও নয় একবারে "কুমারের" উমা চরিত্রের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়—বলিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রমাকান্ত মুখ টিপিয়া কহিল,—এত দূর? আচ্ছা শুনি না কেমন তিনি?

নরেন্দ্র কহিল,—স্বচ্ছ—ঝক্‌ঝকে—একাধারে মিরন্দা কিম্বা শকুন্তলা-যেটা খুসি কল্পনা করতে পারো—সে মুখে যতটুক না বলে, তার ভাব, তার ভঙ্গিমা বলার অধিক জানিয়ে দেয়।

রমাকান্ত কহিল—বিয়ে হ'লে দেখ্‌ছি তাতেই মগ্ন হ'য়ে থাক্‌বে—কোথায় থাক্‌বে তখন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সত্যকার

সাধনা—কোথায় রইবে সেবাব্রত।—সব সত্য প্রিয়া রূপে ফুটে উঠ্‌বে।

নরেন্দ্র একটু চকিত হইয়া কহিল,—কেন বিবাহ হ'লেই সব হারাতে হয়—এমন কোন কথা আছে?

রমাকান্ত। সব হারাতে হয় এমন কিছু কথা নাই যদিও, কিন্তু অশিক্ষিতা বঙ্গমহিলার কাছে সব হারিয়েছি, কথাটা ধরেই নিতে হয়। কারণ তারা প্রেম ছাড়া কিছু জানে না, ভালবাসা ছাড়া কিছু শেখে না—বিশ্ব জগত বলে যে কোন পদার্থ আছে তার নাম গন্ধও তারা কখনো কল্পনাও করে নি। তাদের সংসর্গ নব্য তান্ত্রিকদলের শ্রেয়স্কর নয়।

নরেন্দ্র চিন্তান্বিত হইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ মাথা নত করিয়া থাকিয়া তারপর কহিল,—তাহ'লে কি রমাকান্ত তুমি বল্‌তে চাও—সে বালিকাকে বিবাহ করা আমার কর্ত্তব্য নয়?

রমাকান্ত কহিল,—না বলাটা আমার অন্যায় হ'তে পারে—কিন্তু আমি এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি—তোমার যা প্রবৃত্তি

তাতে শিক্ষিতা বিদূষী মহিলা হ'লেই যোগ্য মিলন হয়— তার আমি ঠিকও করেছিলাম, হরলাল বাবুর তৃতীয়া কন্যা—

নরেন্দ্র বাধা দিয়া কহিল,—থামো ভাই, আমি পিতার মত না নিয়ে এ মতে কখনই মত দিতে পার্‌বো না—কারণ তা হ'তে পারে না।—

রমাকান্ত খানিক গম্ভীর থাকিয়া কহিল, পিতার মত নিতে গেলে তুমি যে জগতের কোন কাজে সুপ্রতিষ্ঠ হ'তে পার্‌বে না, এটা বেশ ব'ল্‌তে পারি।

নরেন্দ্র। হরলাল বাবুরা শুনেছি, না ব্রাহ্ম?

রমাকান্ত। কে বল্লে?—দিব্যি ত হিন্দুদের সঙ্গে চ'লে যাচ্চে—আর যদিই ব্রাহ্ম হয় তুমি কি এখনও জাত জিনিষটাকে খুব বড় বলেই মনে স্থান দাও?—তাহ'লে সে সভাটভা গুলো—

নরেন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিল,—না ভাই কেমন ওটা জন্মগত সংস্কার ছেড়েও ছাড়তে পারি না।

রমাকান্ত। তাহ'লে তাঁদের খবর দেব?

নরেন্দ্র কহিল, না না এত তাড়াতাড়িতে কাজ নাই।

রমাকান্ত তখন গম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—নরেন্দ্র বেঁকে চলার পথ এ নয়, যদি সত্য ভাবে ভারতবর্ষকে হৃদয়ে গ্রহণ কর্‌তে চাও, তবে হরলালবাবুর বিধবা কন্যাকে তোমায় বিবাহ কর্‌তেই হবে। আর যদি সাধারণের মত সনাতন প্রথায় শুধু বংশের পিণ্ডটাই বজায় কর্‌তে চাও—তবে পিতৃ-পিতামহদের সনাতন পথে চলাই শ্রেয়—আমি তোমায় চিঠিতে লিখি নাই যে—আমাদের বিবাহ সাধারণের মত নয় —আমরা যে চ'লেছি দুর্গমের যাত্রী হ'য়ে—আমাদের মন্ত্র যে কেবল দুঃসাহস—আকাঙ্ক্ষার দুঃসাহস—শক্তির দুঃসাহস। বুদ্ধির দুঃসাহস! আমরা যে বাঁচবো মরণের মধ্য দিয়েই—একটা অবিরল কলধ্বনিময় সমুদ্র কল্লোলের সম্মুখে যেন নরেন্দ্র আপনাকে হারাইয়া ফেলিল, তাহার মধ্যে যত গুলা "না" ছিল সব গুলা এক হইয়া রমাকান্তেরই বাক্যজালের ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া গেল। নরেন্দ্র রমাকান্তের দিকে চাহিয়া কহিল,—বিধবার সঙ্গে বিবাহ?—তা ত কল্পনাও করি নাই!

রমাকান্ত কহিল,—না কল্পনা করে থাকো, আজ ক'রে যাও, যদি মনুষ্যত্বের স্পর্দ্ধা রাখ্‌তে চাও, তবে একটা অনাথা

বিধবার চক্ষের জল মোছাতে হ'বে। সমাজকেও' জানাতে হ'বে হিন্দুর ভিতরে এখনও এমন মানুষ আছে, যারা মানবতার উপাসক, সত্যের পূজারী, শুষ্ক পকতার মরুভূমিই মাত্র যারা নয়।

নরেন্দ্র খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল,—যার সঙ্গে কথা হবে তিনি রাজী হবেন কেন?

রমাকান্ত কহিল, এ বঙ্গসমাজে নারীর আবার স্বাতন্ত্র্য কোথায়? অধিকারই বা কোথায়? তবে শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে আর অভিভাবকেরাও শিক্ষিত তাঁদের মত আছে।

নরেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল।

রমাকান্ত উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিতে লাগিল,—নরেন্দ্র ভূত ভবিষ্যৎ ভুলে যাও। মনে থাকে যেন মানুষের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য—মনুষ্যত্বের পূর্ণ অধিকার বিস্তৃতির জন্য—দেশে আদর্শ পুরুষের আবশ্যক হ'য়েছে! কাঁটাবন পরিষ্কার করতে সহসা কেউ অগ্রসর হ'তে চাইবে না. ভাববে, কেন? এ বেশ নিশ্চিন্ত আছি! কিন্তু যাদেরই কখন পথের প্রয়োজন হ'য়েছে, তারাই আর কোন বাধাকে বাধা ব'লে মেনে না নিয়ে সব অত্যাচার মাথায় তুলে

স্বীকার করে নিয়ে ব'লেছে আমরা চলবোই, তা দুঃখের মধ্য দিয়া হউক বা দুর্গতির মধ্য দিয়া হউক—আমাদেরও যদি সেই অভাব বোধ হ'য়ে থাকে তবে আমরাও কি হঠবো বলতে চাও ?

নরেন্দ্র নির্ব্বাক্ হইয়াই রহিয়া গেল। একটা কিছু উত্তর দিতে পারিল না ; রমাকান্তর বক্তৃতার মধ্যে এমন অভিভূত হইয়া গিয়াছিল—রমাকান্তর কথাটাকে শ্রেয় বলিয়া মানিয়া লইতেও তাহার কিছুমাত্র বাধা ঠেকিতেছিল না অথচ হিমানী আর তার পুষ্পোজ্জ্বল মাধুরীটুকুও ভুলিতে পারিতে-ছিল না। এমন সময় ঘড়িতে পাঁচটা বাজিয়া গেল, নরেন্দ্র তাহার বাসার দিকে যাইবে মনে করিল।

রমাকান্ত কহিল,—সমস্তটা ঠিক বুঝে ভেবে দেখো, সমাজের ভ্রূকুটি সইতেই হবে।

নরেন্দ্র কহিল,—সমাজের কাছ হ'তে এর জন্য যে বিদায় নিতে হবে তা আমি বেশ ভেবে রেখেছি।

রমাকান্ত। তাতেই বা ভয়টা কিসের নরেন্দ্র ? আমরা ত সমাজকে ত্যাগ করতে চাই না—সমাজ যদি আমাদের ইচ্ছা করে ত্যাগ ক'রে—কি করবো ? আমরা তবু ভণ্ডদের

মত সত্যকে সমাজের খাতিরে ত্যাগ করতে পারি না,—তা'হলে আমাদের শ্রেয় কোথায়? আমরা যে এত বিরোধের মধ্যে লড়বো সে ত কেবল সত্যেরই জোরে—নরেন্দ্র! সত্যকে হারালে আমাদের সাধনা ব্যর্থ হ'য়ে যাবে! যদি প্রয়োজন হয় আমরা সমাজের দুর্গদ্বার ভাঙবো তবু সত্যকে ত্যাগ করবো না। আমরা সমাজকে জানাবো বিধবা বিবাহ ক'রেছি—এবং ইহার মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতা কিছুই নাই।

নরেন্দ্র কহিল,—আমি ভেবে কাল উত্তর দেব রমাকান্ত, আজ চল্লুম।

রমাকান্ত কহিল,—আমি তোমার বাসায় যেয়েই উত্তর আনবো। এখন যাও!

নবম পরিচ্ছেদ

বাসায় আসিয়া বামুন ও চাকরদের খবর পাঠাইয়া নরেন্দ্র আপনার ঘরটিতে আসিয়া আশ্রয় লইল। বিবেকানন্দের একখানা বই হাতে করিয়া ভাবিতে লাগিল তাই ত

নবম পরিচ্ছেদ

বিধবার সঙ্গে বিবাহ? তাই বা কেমন করিয়া সম্ভব? কথাটাকে আমল দিতে যতই ইতস্ততঃ করিতেছিল কথাটা ততই তাহাকে পাইয়া বসিতেছিল। এবং ক্ষণে ক্ষণে কলিকাতা আসিবার সময় বিধবা ক্ষীরোদার বেদনাভরা বাক্যগুলি মনে পড়িতেছিল। ভাবিয়া দেখিল, কথাটাকে নিতান্ত ছুঁড়িয়া ফেলিবারও নয়! সমাজের নিদারুণ নিষ্ঠুরতায় নির্য্যাতিত বাল-বিধবার ক্রন্দনে আকাশ ছাইয়া উঠিতেছে। তাহাদের হৃদয়ে শান্তি নাই, প্রাণে উৎসাহ নাই, বাঁচিয়া থাকিতে হইলে মানুষ যে-আশাগুলি করিতে পারে তাহাদের সে আশাগুলি পর্য্যন্ত করিবার অধিকার নাই। শুধু ব্রহ্মচর্য্য—আর ব্রহ্মচর্য্য!—যে জ্ঞানহীনা অবোধ বালিকা স্বামী কেমন চক্ষেও দেখে নাই—তাহারও পক্ষে সেই বিধান!

দেশের অসহায়া অবলাদের কথা চিন্তা করিতে করিতে তাহার হৃদয়টা ভারি বেদনাগ্রস্ত হইয়া উঠিল। সে এতদিন এ সম্বন্ধে যে কোন আলোচনা করে নাই—তাহারও জন্য অনেকখানি অনুতপ্ত হইল, মনে মনে কহিল, পিতার চক্ষে এটা অন্যায় বিবেচনা হয় হউক—আমাকে একবার

এ সম্বন্ধে বেশ প্রাণ মন দিয়াই আলোচনা করিতে হইবে। হিমানীর কথাটাও সে সময় মনে পড়িয়া যাওয়াতে সে কহিল, তাহার এখনও কুমারী জীবন যদিও পিতা তাহাকে তাহারই সহিত বিবাহ দেওয়াইবার জন্য আনিয়াছেন—তবু পিতা ইচ্ছা করিলে আরও ভাল, অনেকের সহিত তাহার বিবাহ দেওয়াইতে পারিবেন। কিন্তু বিধবার গতি কোথায় ?

সহসা ধক্ করিয়া একটা কথা মনে পড়িয়া তাহার সব ওলটপালট হইয়া গেল।

মনে পড়িল, সেই যে একদিন সন্ধ্যাবেলায় হিমানীকে কাছে টানিয়া বলিয়াছিলাম, "এই আমাদের বিয়ে এই সন্ধ্যাবেলায়" হিমানীও নীরবে সে কথায় সায় দিয়া গিয়াছিল—তাহার কুমারী জীবন যে নরেন্দ্রে পূর্ণ হইয়া আছে।

নরেন্দ্র অস্থির হইয়া বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িল। দুই প্রবল স্রোতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল। একদিকে কঠোর কর্ত্তব্য আর অন্যদিকে মধুর প্রেম।

হিমানী বিজড়িত গ্রীষ্মাবকাশের সমস্ত স্মৃতিগুলি একটা

নবম পরিচ্ছেদ

স্বপ্নের মত তাহার চক্ষেব সম্মুখে বিচিত্র হইয়া উঠিতে লাগিল। নরেন্দ্রের মনে হইতে লাগিল যেন তাহার হৃদয়ে প্রেম ছিল না, বালিকা তাহার মধুর হাসিটি দিয়া সে হৃদয়ে প্রেমের আলোক জ্বালাইয়া দিয়াছিল। আহারে বিহারে সে সেবাপরায়ণা বালিকার ঐকান্তিক আগ্রহও যে ভোলা একেবারে দুঃসাধ্য। সর্ব্বস্ব আনিয়া যে তাহার চরণেব মূলে রাখিয়া গিয়াছে—তাহাকে কি বলিয়া বলিবে তুমি যাও।

নরেন্দ্র বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। আকাশে তখন তারা ফুটিয়া গিয়াছে, জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যায় মেঘেরও অসদ্ভাব নাই। দূরে কোথায় মেঘ করিয়া সেখানকার বিদ্যুৎ প্রভাটা এখানকার আকাশকেও চমকিত করিয়া দিতেছিল।

নরেন্দ্র ভাবিতে লাগিল—শীঘ্রই ত পরীক্ষা, আর বিলম্ব নাই। রমাকান্ত যখন এ ব্যাপারের মধ্যে—তখন আমায় শীঘ্রই সাফ্ জবাবের সম্মুখীন-হইতে হইবে। কিন্তু সাফ্ জবাবটা দেওয়াও যে দুঃসাধ্য, আশাহীনা অসহায়া

অবলার তা হইলে গতি কি হয়? আর এদিকে আশাভরা কুমারী হৃদয়টাকেই বা কি বলিয়া প্রবোধ দেয়?

নরেন্দ্রের ইচ্ছা করিতে লাগিল—তখনই বন্ধু রমাকান্তের কাছে ছুটিয়া গিয়া বলে—সে বিবাহ করিতেই মোটে রাজি নয়! এবং যাইবার জন্য প্রস্তুতও হইয়া উঠিল। কিন্তু ভাবিল, একটা বালিকার সহিত ছেলেমির কথা বন্ধুকে আর কি বলিব? যাহা বলিবার তাহা ত বলা হইয়া গিয়াছে, এদিকে দূর আকাশের সেই মেঘটাও আকুল হইয়া আসিতেছিল।

কিন্তু রমাকান্ত যদি উত্তর দেয়—একটা কুমারীর জীবনে আর একটা বিধবার জীবনে ঢের তফাৎ, কুমারীকে অনুগ্রহ করিতে—তাহাকে বিবাহ করিতে—অনেকে আছে। কিন্তু বিধবার পক্ষে কয়জন অগ্রসর? সহজ পিতৃস্নেহ ভ্রাতৃস্নেহ পর্য্যন্ত যখন তাহাদের উপর পাষাণ ভারের মত হইয়া আছে।

নরেন্দ্র প্রবল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, নিষ্ঠুর সমাজ! আর ততোধিক নিষ্ঠুর সমাজের বিধিনিয়ন্তৃগণ—তাহাদিগকেই শুধু সহিতে হয় কেন?

নরেন্দ্র সংকল্প করিল, তাহাকে দুর্ব্বলের পক্ষই অবলম্বন করিতে হইবে।

দশম পরিচ্ছেদ

রাত্রের ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ভোরের দিকে খুব বেশী একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তাই যখন বিছানা হইতে জাগিয়া উঠিল, তখন দেখিল, সূর্য্যালোকে আকাশ একবারে ঝলমল করিতেছে, আর দ্বারের কাছে বৃদ্ধ ভৃত্য রামনারায়ণ দণ্ডায়মান।

নরেন্দ্র মুখে জল দিতে দিতে কহিল,—কি খবর রামনারায়ণ ?

রাম একখানি পত্র বাহির করিয়া দেখাইয়া কহিল, রমাকান্তবাবু তাঁর চাকরকে দিয়ে এই পত্র পাঠিয়েছেন, বিশেষ জরুরী কাজও আছে ব'লে দিয়েছেন।

নরেন্দ্র গামছায় মুখ মুছিয়া পত্রখানা খুলিয়া দেখিল,—কি কাজ তাহা রমাকান্ত খুলিয়া লেখে নাই, কিন্তু অতি অবশ্য যাইতে লিখিয়াছে।

নরেন্দ্রের বুঝিতে বাকি রহিল না যে কি কাজের জন্য তাহার এত জরুরী ডাক পড়িয়াছে।

নরেন্দ্র কহিল, রমাকান্তবাবুর ভৃত্যকে যেতে বলো, আমি শীঘ্রই যাচ্ছি।

রামনারায়ণ চলিয়া গেল।

নরেন্দ্র প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া যখন রমাকান্তের বাড়ীতে উপস্থিত হইল, তখন আর দুইটি অপরিচিত ভদ্র-লোক রমাকান্তর টেবিল সরগরম করিয়া তুলিতেছিল।

নরেন্দ্র যাইতেই সকলে বিশেষ অভ্যর্থনা করিয়া নরেন্দ্রকে নমস্কার করিল। নরেন্দ্রও প্রতিনমস্কার করিয়া আসন পরিগ্রহ করিল।

রমাকান্ত নরেন্দ্রের দিকে একটা সকৌতুক কটাক্ষপাত করিয়া কহিল,—নরেন্দ্রনাথ, এঁরাই সেই বিধবাটির ভাই, —উপেনবাবু আর সুরেনবাবু; হরলালবাবু এই দুই পুত্র আর দুই কন্যা রেখে পরলোক গত হয়েছেন। তন্মধ্যে একটি দুর্ভাগ্যক্রমে বিধবা।

নরেন্দ্র চশমার ভিতর হইতে একবার তাঁহাদিগকে দেখিয়া লইয়া রমাকান্তের দিকে চাহিল।

রমাকান্ত কহিল,—এঁদের একটা উত্তর তোমায় দিতে হবে। তোমার ত আর অবিদিত নাই, সমাজে বিধবার বিবাহ হওয়ার কি আশু আবশ্যক হ'য়ে প'ড়েছে। আর এঁরাও সে বিধবাটির বিবাহ দিতে চান।

নরেন্দ্র চশমাটি চোখ হইতে খুলিয়া কোঁচার খুঁটে মুছিয়া কহিল, এঁরা ত চান, এখন কথা হ'চ্ছে বিধবাটির ত এ বিবাহে কোন অমত নাই?

রমাকান্ত কহিল,—না কিছুই না। ভাই দাদা যা করবে তাতে কোন স্ত্রীলোকের অমত থাকতে পারে?

উপেন্দ্র কহিল, হুঁ অমত? আগেকার বিবাহের কথা তার মনেই নাই—তা আবার বিবাহ করতে চাইবে না কেন?

নরেন্দ্র কহিল,—আপনারা ত ব্রাহ্ম নন, হিন্দু? সমাজে এ বিবাহের পর আপনাদের স্থান হবে ত?

সুরেন্দ্র কহিল,—আপনার যদি হয়—তা আমাদেরই না হবে কেন? উপেন্দ্র কথাটি কাড়িয়া লইয়া কহিল, আর যদি না-ই হয়—তাতেই বা কে পেছপাও হ'চ্ছে—যে সমাজে অত্যাচার ছাড়া কিছু নাই, সে সমাজ হ'তে যত

শীগ্‌গীর খ'স্‌তে পারা যায় ততই ভাল,—দিব্যি ব্রাহ্মসমাজ খোলা রয়েছে।

সুরেন্দ্র কহিল, সে যা বলেছ সত্য, দাদা! ব্রাহ্মসমাজের সকলই ভালো, তবে কি না শুধু ঐ দীক্ষা নেওয়ার কথাটা মনে হ'লে আমার প্রাণটা কেমন ক'রে ওঠে—না হয় আমরা নব্য হিন্দু—এই রকম একটা কিছু নাম নেব।

উপেন্দ্র কহিল—সে পরের কথা পরে হবে এখন রমাকান্ত বাবুকে বলো যাতে নরেন্দ্রবাবুর মত হয়।

নরেন্দ্র প্রস্তুত হইয়াই বাসা হইতে বাহির হইয়াছিল, কহিল,—আমার কোন অমত নাই। যেদিন খুসি আপনারাই দিন ধার্য্য ক'রে পাঠাবেন।

দুই ভ্রাতাই কৃতজ্ঞ হইয়া কহিল,—কন্যা দেখাটা—

নরেন্দ্র কহিল,—রমাকান্ত বাবু যখন দেখেছেন, তখন আমার না দেখ্‌লেও চ'লে যাবে। আর পারিত একদিন আস্‌তে পারি।

তাহারা দুই জনেই বার বার নমস্কার করিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইয়া উঠিয়া গেল।

তাহারা উঠিয়া যাইতেই রমাকান্ত উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে নরেন্দ্রের গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, তুমি যে একেবারেই এতটা মত দেবে, আমি তা ভাবি নি—আমি ভেবেছিলাম, অন্ততঃ পিতার কথা তুলেও আমাদের দু'দিন অপেক্ষা করতে ব'লবে। কিন্তু তুমি বীরের মত একেবারেই কঠোর সত্যের সম্মুখীন হ'য়েছ!

নরেন্দ্র কহিল, সত্য যখন আমার প্রাণের মধ্য হ'তে তার রক্ত দাবী ক'রছে, তখন ইতস্ততঃ করবার সময় আর কৈ? বিধবাবিবাহের যৌক্তিকতা যখনই হৃদয়ঙ্গম হ'য়েছে, তখনই আমার পিতা, পিতার সম্পত্তি—পিতার সমাজ, আর হিমানীকে মনে পড়েছে, কিন্তু আমার কাছে, স্নেহ প্রেম অপেক্ষা কর্ত্তব্যের ও সত্যের আসনই উচ্চে—এই জন্য আমি কথাটি কইলাম না—যেমনি তুমি ব'ললে অমনি সায় দিয়ে গেলুম, এখন আমার কর্ত্তব্য শুধু বাড়ীতে একখানা চিঠি লিখে, হিমানীর বিবাহ সম্বন্ধে আমার শেষ কর্ত্তব্য স্থির করে দেওয়া।

হিমানী বলিতে বলিতে নরেন্দ্রের চক্ষু অনেকটা অশ্রু-

ভাবাক্রান্ত হইয়া উঠিল; এবং স্বরের স্বাভাবিকতারও অনেকখানি বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হইল।

রমাকান্ত সেটা লক্ষ্য করিয়া অনুতপ্তচিত্তে কহিল, তুমি হিমানীকে খুব ভাল বাস্তে না?

নরেন্দ্র কোন উত্তর দিল না, টেবিলের উপরে একটা বড় ইংরাজী মাসিক পড়িয়াছিল, তাহারই পাতা উল্টাইয়া যাইতে লাগিল।

রমাকান্ত কহিল,—নিশ্চয়ই ভালবাস্তে, আমি তা বুঝেছি।

নরেন্দ্র গম্ভীর অথচ ধীরকণ্ঠে কহিল,—যদি বুঝেছ, তবে আবার সে কথা তুল্ছো কেন? সে যখন চুকে-বুকেই গেছে—

রমাকান্ত দু'বার "তা বটেই ত" বলিয়া ঘাড় নাড়িতে লাগিল। তাহার মুখে একটা ভাল সান্ত্বনার কথাও যোগাইল না।

নরেন্দ্র কহিল,—শোন রমাকান্ত! আমি হিমানীকে কতটা :ভালবাস্তাম, তা জানি না—কিন্তু হিমানী যে তার সর্ব্বস্ব দিয়ে আমায় বন্দনা করেছিল, সেইটেই ভেবে

আকুল হ'চ্ছে লতাটির মত সে আমায় জড়িয়ে ধ'রেছিল। তবু আমি কর্ত্তব্যের খাতিরে সে লতা ছিঁড়ে দূরে ফেলে দিলাম। তাকে আবার এক নতুন জীবনের পত্তন আরম্ভ করতে হবে। আবার তাকে নতুন ছলা, নতুন ঠাট নিয়ে, আর এক জনের মন হরণের জন্য, বোঝাপড়া করতে হবে। অবশ্য তার কুমারী জীবন ব'লেই, তার পক্ষে নিষ্কৃতি; নইলে, এদেশ, সীতা, সাবিত্রীর পুণ্যচরিত কথায় পূরিত— তার পক্ষে এই আয়োজনও কি ভয়ঙ্কর হবে। বলিতে বলিতে নরেন্দ্রের স্বর হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গেল। স্থির অপলক দৃষ্টিতে সামনের খোলা জানালাটার পানে চাহিয়া রহিল। যেন ভিতরে তাহার বড় একটা রক্তারক্তি ব্যাপার ঘটিয়া যাইতেছিল কর্ত্তব্যের পাষাণভারে বাহিরে তাহার প্রকাশ কিছুই হইয়া উঠিতেছিল না।

রমাকান্তও নরেন্দ্রের পানে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল, সান্ত্বনা দিবার একটা কথাও তাহার আদৌ জোগাইল না। জোগাইবে কোথা হইতে? সেই যখন সকল ব্যাপারের মূল।

তাহার ভিতর হইতে যেন একটা রাক্ষস বাহির হইয়া

শ্মশানের ক্ষুধিত কুকুরটার মত লকলক জিহ্বা মেলিয়া এই রক্তধারা চাটিতে লাগিল। একটু সে কম্পিতও হইল না—বা, করুণায় একটু আর্দ্রও হইল না—মমতাহীন কঠোর দার্শনিকের মত নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

অনেকক্ষণের পর নরেন্দ্র উঠিতে উদ্যত হইলে রমা-কান্ত কহিল,—"কালেজ কামাইটা তোমার পক্ষে ঠিক ভাল হবে না, যেও"—আর কিছুই সে বলিতে পারিল না—

নরেন্দ্রও কোন কথা না বলিয়া বাসার দিকে চলিয়া গেল।

কলিকাতার রাস্তায় অনন্ত জনপ্রবাহ। নরেন্দ্রের পক্ষে মনে হইতেছিল যেন কেহ নাই। কারণ তাহার ভিতর হইতে কেবলি একটা স্বর আর্ত্তকণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছিল, এত বড় বিশ্বসংসারে এমন বন্ধু কেহ কি নাই, যে তাহাকে, এই কঠোর কর্ত্তব্যের দায় হইতে বাঁচাইতে পারে? কর্ত্তব্যটা যেন জগদ্দল পাথরের মত তাহার বুকে চাপিয়া বসিয়া যাইতেছিল। সংসার, পিতা, হিমানী যতই মনে পড়িতেছিল, ততই তাহার যেন কণ্ঠ রোধ হইবার উপক্রম হইতেছিল।

সে বেশ বুঝিয়াছিল, এ বিবাহ হইলে তাহাকে পিতার সব স্নেহ হারাইতে হইবে।

হায় একবার মাত্র—একবার যদি কেহ তাহাকে নিষ্কৃতি দেয়—নরেন্দ্র তাহা হইলে হাঁপ ছাড়িয়া বাচে, তন্দ্রাঘোরে স্বপ্নেও একবার সে কি নিষ্কৃতির হাঁপ ফেলিতে পাইবে না? কর্ত্তব্যের কাছেই আপনাকে বলি দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে?

হায় পিতা! হায় হিমানী!

একাদশ পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্র কলিকাতা যাওয়ার পর হইতে দেশের বাড়ীতে যে একটা বিষাদ স্তূপীভূত হইয়াছিল, নরেন্দ্রের পত্র-প্রাপ্তিতে সে বিষাদ অনেকটা থামিয়া গিয়াছিল। উপস্থিত আবার পত্র বন্ধ হওয়াতে রাজশেখর বাবু আবার চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

পদ্মাবতীকে কহিলেন,—"বেহান তুমি ঠিক করো,আমি

এই আষাঢ় মাসের মধ্যেই নরেনের বিবাহ দিতে চাই।” নরেন্দ্রের এই উচ্ছৃঙ্খল ভাবটা তাঁহার আদৌ ভাল লাগিতেছিল না। একটা বন্ধনে না জড়াইতে পারিলে যেন তাহার পক্ষে শ্রেয়ো নাই।

পদ্মাবতী জনান্তিকে কহিল, “আমার ঠিক আর অঠিক কি আছে। আপনার মেয়ে, আপনার ছেলে, যখন খুসি বিবাহ দিতে পারেন।”

রাজশেখর বাবু চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে পাঁজি দেখিয়া শুভ-বিবাহের দিন স্থির করিতে বলিলেন।

চক্রবর্ত্তী ২৮শে দিনস্থির করিয়া বলিলেন, “আমি যা স্থির কর্‌লাম, কোন বিদ্যাদিগ্‌গজএর ক্ষমতা নাই—তার ভুল ধ’র্‌তে পারে,” বলিয়া দীর্ঘ টিকি আন্দোলিত করিয়া নিজের দিন দেখার অনেক প্রশংসার কথা তুলিলেন। কোন কালে দিন দেখিয়া গরবাড়ীর রাজবাড়ী হইতে যে নগদ একশত টাকা ও পিতলের ঘড়া উপহার পাইয়াছিলেন, তাহাও বলিতে বাদ গেল না।

রাজশেখর বাবু কহিলেন,—সে যাই হোক, এই জন্য আমাকে যখন বাজার কর্‌তে কলকাতা যেতেই হ’চ্ছে,

তখন নরেনকে আর পত্র দিয়ে কি হবে একবারে সঙ্গে নিয়ে আস্‌বো।—

চক্রবর্ত্তী কহিলেন—"অবিশ্যি, কিন্তু দেখ্‌বেন ব্রাহ্মণদের যে পিতলের গামলাগুলো দেবেন, সেগুলো যেন একটু ভাল হয়—আর গ্রামের ছোট লোকদের গেলাস বাটী দেন, আর নাই দেন, তাতে তত এসে যায় না!—তবে বিবাহ উপলক্ষে যা দিতে পারেন তাই ভালো। কিন্তু ব্রাহ্মণকেই দান হচ্ছে দান—আর ও সব তামসিক"—বলিয়া যত্ন করিয়া হুকায় নল লাগাইয়া তামাক টানিতে লাগিলেন।

রাজশেখর বাবু কহিলেন,—ব্রাহ্মণদের জন্য ভালই আন্‌বো চক্রবর্ত্তী মশাই, তার জন্য ত ভাব্‌ছি না, ভাব্‌ছি শেষ আষাঢ়ে বিয়েটা হবে, বর্ষার দিন—তাতে একটি মাত্র ছেলের বিবাহ।

চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—বিবাহের দিনের জন্য আবার ভাবনা? বলুন না আর একটা দিন আছে ২১শে, তাতেও স্থূতহিবুক যোগে লগ্ন, নেহাৎ মন্দ ত হবে না।

কথাবার্ত্তা চলিতেছে; এমন সময় ডাকপিয়ন আসিয়া রাজশেখর বাবুর হাতে একখানা পত্র দিয়া চলিয়া গেল।

চিঠির লেখা দেখিয়াই বুঝিলেন লেখা নরেনের, তাড়াতাড়ি চোখে চশমাটা লাগাইয়া পত্র পড়িতে লাগিলেন,—

এক লাইন দু লাইন ধরিয়া ধরিয়া পত্রখানা পড়িয়া গেলেন, পড়িয়া তাঁহার যেন কেমন ধাঁধা উপস্থিত হইল।—ললাটের শিরা-উপশিরাগুলা স্ফীত হইতে দেখা গেল।

চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—নরেন ভাল আছে ত?

রাজশেখর বাবু কহিলেন, হুঁ—বলিয়া ঘরের দিকে কেমন অস্থির ভাবে উঠিয়া গেলেন, যাইয়া আবার আর একবার পত্রখানা পড়িলেন, দেখিলেন, সেই এক কথা লেখা রহিয়াছে, "তাহার কলিকাতায় বিবাহের দিন স্থির হইয়া গিয়াছে—হিমানীর অন্যত্র বিবাহ দেওয়া হউক।"

হিমানীকে পছন্দ না হয় আরও ত অনেক পাত্রী রহিয়াছে, কিন্তু একবারে দিন স্থির—এ কি রকম কথা?—

তবে কি তার পিতা, পিসিমা, কাউকে চাই না?

না চাই যদি তবে এত বিনয় করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কেন?

একাদশ পরিচ্ছেদ

"আমি অধম পুত্র" "ক্ষমা করুন" এ সব কি কথা ?

রাজশেখর বাবু তীব্র দৃষ্টিতে পত্রখানার উপর চক্ষু বুলাইয়া ভাবিলেন, এ জালপত্র নয় ত ? কেহ বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া মজা দেখিতে লেখে নাই ত ? নরেনের পুরাতন হস্তাক্ষরের সহিত মিলাইয়া দেখিলেন। জাল ভাবিবার কোন কারণই নাই।

পত্রখানার প্রত্যেকটি অক্ষর বৃশ্চিকের মত তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল। তবু দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবারও উপায় নাই—স্নেহ—দারুণ স্নেহ যে তার সব দ্বার রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—একথা কাহারও কাছে প্রকাশ করাও উপযুক্ত বিবেচনা করিলেন না—আস্তে আস্তে ভারাক্রান্ত চিত্তে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, ভগ্নীকে ডাকিলেন, প্রসন্ন !

প্রসন্ন আসিয়া উপস্থিত হইলে কহিলেন,—আমার কলকাতা যাওয়ার উদ্যোগ ক'রে দাও, আমি আজই রওনা হবো।

প্রসন্ন কহিলেন,—বিয়ের দিন সে ত ২৮শে হ'য়েছে দাদা ? এরি মধ্যে যাবে ?

রাজশেখর কহিলেন,—হাঁ আমায় এরি মধ্যে যেতে হবে। স্বরে একটা উৎসাহ কি আনন্দের আভাষ নাই।

প্রসন্ন সেটা তৎক্ষণাৎ ধরিয়া ফেলিয়া ব্যাকুল স্বরে কহিলেন,— নরেনের ত কোন অসুখ করে নাই দাদা?

রাজশেখর কহিলেন,—না, আমি তাকে আন্‌তেই যাচ্ছি—তোমরা আয়োজন উদ্যোগের কামাই দিও না। বলিয়া আস্তে আস্তে আপনার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে ডাকিলেন, হিমানী!

হিমানীর মাতা কহিলেন,—যা—যা হিমানী কর্ত্তার স্নানের তেল আর গামছা দিয়ে আয়—

হিমানী তাড়াতাড়ি একটা তেলের বোতল, কাচের বাটি ও গামোছা লইয়া উপস্থিত হইল।—

রাজশেখর বাবু কহিলেন,—হিমানী এতক্ষণ কোথা ছিলে তুমি?

অন্যান্য দিন রাজশেখর বাবু তাঁহাকে স্নেহের স্বরে মা ও তুই সম্বোধন করিতেন, আজ সে স্বরের ব্যতিক্রম দেখিয়া হিমানী চকিত হইয়া উঠিল। করুণ আর্ত্ত স্বরে কহিল, বাবা আজ কি তোমার কেন অসুখ হ'য়েছে?

একাদশ পরিচ্ছেদ

রাজশেখর বাবু কহিলেন,—না, পরে একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, তুই ভেবেছিলি বুঝি—আমার অসুখ হ'য়েছে তা—

হিমানী বোতলের ছিপি খুলিয়া তেল ঢালিয়া রাজশেখর বাবুকে তৈল মাখাইতে লাগিল, রাজশেখর কহিলেন,—তুই যদি আমাদের আর না হ'স হিমানী তাহ'লে কি তুই আমাকে আর তেল মাখাতে আস্‌বি—বাবা ব'লে—

হঠাৎ একথা শুনিয়া হিমানী চঞ্চল হইয়া উঠিল, খুব খানিকটা তেল ঢালিয়া ফেলিয়া বৃদ্ধের পৃষ্ঠদেশটা দলন করিতে করিতে বলিল,—বাবা, একথা কেন ব'ললে বাবা ?

রাজশেখর বাবু কহিলেন,—আর তোর যদি আমাদের বাড়ীতে না বিয়ে হ'য়ে, আর কোথা হয়—তা হ'লে আস্‌বি কি ?—

রাজশেখর বাবুর মুখে সহসা একথা শুনিয়া তাহার বৃহৎ চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া উঠিল, সে নীরবে দাঁড়াইয়া গেল।

রাজশেখর বাবু হিমানীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, তা হ'লে তুই ভুল্‌তে পার্‌বি নে কেমন ?

না—গো না, বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে হিমানী দ্রুত সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া গেল।—

রাজশেখর বাবুরও আশ্বাস দিবার কথা ফুরাইয়া গিয়াছিল। তাই তিনিও কিছু বলিতে পারিলেন না।

বালিকা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীচের সিঁড়ির দরজার কোণে কাঁদিয়া তারপরে অনেক কষ্টে আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া তেতালার নিরালা ঘরটিতে অদৃশ্য হইয়া গেল—সেদিন আর সারাদিনে কেহ হিমানীকে বাড়ীর মধ্যে দেখিতে পাইল না।

সন্ধ্যার সময় রাজশেখরবাবু কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

প্রসন্নময়ী ঠাকুর দালানে প্রতিমার পাটাতনে গিয়া মাথা খুঁড়িয়া কহিলেন,—মা তুর্গা তোমায় চিনির নৈবেদ্য চেলির শাড়ি দিয়ে পূজো দেব মা—দাদা যেন নরেনকে নিয়ে নির্ব্বিঘ্নে ফিরে আসে—

পদ্মাবতীও আজ সেইরূপে প্রার্থনা ও প্রণাম করিলেন।

হিমানীও ঠাকুর দেবতাদের কাছে মনে মনে প্রার্থনা করিয়াছিল কি না কে জানে? তবে সে অনেকক্ষণ অবধি কাঁদিয়া ঠাহর করিতে পারে নাই, কর্ত্তা রাজশেখর

এরূপ কথা কেন বলিলেন, বাড়ীর আর কেহ ত তাহাকে অপছন্দ করে নাই। তবে কি নরেনবাবুরই পছন্দ হইল না? অনেকদিনকার একটা সন্ধ্যাবেলার কথা মনে পড়িয়া সেটাও সে ভাল বিশ্বাস করিতে পারিল না। তবু তাহার মনের মধ্যে এ দুর্ভেদ্য—দুশ্ছেদ্য—যন্ত্রণাটা এমন ভাবে কেন জড়াইয়া রহিল? এ চিন্তাসূত্রের তাহার কোথায় অবসান হইবে?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

রাজশেখর বাবু কলিকাতা পৌঁছিয়াই যাহা শুনিলেন তাহাতে তাঁহার সব আশা এক মুহূর্ত্তেই পণ্ড হইয়া গেল। তিনি পত্র পাইয়াছিলেন শুধু,—পুত্র বিবাহার্থী, এমন করিয়া বিধবার পাণিপ্রার্থী তাহা ত শোনেন নাই!

চক্ষের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী যেন ঘুরিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ প্রেম যেন উপবাসী অনাথ

শিশুদের মত, তাঁহার বক্ষের রুদ্ধ দ্বারের কাছে হাহাকার করিয়া কান্না জুড়িয়া দিল।

একবার মনে করিলেন নবীন বাঁড়ুয্যের দোকান হইতেই ফিরিয়া যাই। কিন্তু তবু কি জানি প্রাণের মধ্যে কোথায় একটা আশার ক্ষীণ রেখা জ্বলিতেছিল, ভাবিলেন, এ বিবাহওত পণ্ড হইয়া যাইতে পারে—তা ছাড়া নরেন্দ্রকেও দু কথা দশ কথা বেশ বলিবার আছে—সে যে আর বংশের তিলক নয় সে যে ধর্ম্মত্যাগী ত্যাজ্য-পুত্র, সে কথাটাও বলা চাই।

নরেন্দ্রের বাসায় পৌছিয়া দেখিলেন বাসা ভিতর হইতে বন্ধ, চারিদিকে কাণ পাতিয়া কোথাও একটা কোলাহলও শোনা যায় না—অনেকক্ষণ ধরিয়া ডাকাডাকিতে এক বৃদ্ধা ঝি আসিয়া দোর খুলিয়া দিয়া গেল।

রাজশেখর বাবুকে ঝি চিনিত, সে একটা চৌকি আনিয়া বসিতে দিল।

রাজশেখর বাবু কহিলেন,—বলি বাছা বলো. দেখি ব্যাপারটা কি?

ঝি প্রথমে খুব খানিকটা ঘোমটা টানিয়া তারপর

আস্তে আস্তে সবটা উন্মোচন করিয়া ফেলিয়া বেশ একটু ভঙ্গিমার সুরেই কহিল,—সে আর কি ব'লবো বাবু? ওই রমাকান্তই যত অনিষ্টের গোড়া—আমাদের বাবুত রাজী হন নাই, এ কিন্তু সেই তাকে রাজী করিয়ে কোথাকার এক বিধবার সঙ্গে বিবাহ—দেওয়ালে—কাল বিবাহ হ'য়ে গেছে আজকেই সব আস্‌বার কথা আছে।

রাজশেখরবাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

ঝি কহিল,—তামাক সেজে এনে দেব বাবু?

বাজশেখর বাবু কহিলেন,—না। তারপর একটা গাঢ় দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, তাহ'লে আজই তারা আস্‌বে, কি বলো?

ঝি কহিল,—হাঁ বাবু!

রাজশেখর বাবুর মনের মধ্যে তখন একটা তুমুল ঝড় বহিয়া যাইতেছিল, একদিকে তাঁহার পৈতৃক ধর্ম্ম আর একদিকে পুত্রের উচ্ছৃঙ্খলব্যবহার, তাঁহাকে বড় পীড়া দিতেছিল—তিনি ভাবিতেছিলেন যদি পুত্রকে গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে পুত্রকেই পাওয়া যায়—কিন্তু সমাজধর্ম্ম

হারাইতে হয় ; যে ধর্ম্ম মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা বড় সেইটেই হারাইতে হয়।

রাজশেখরবাবু ভাবিয়া দেখিলেন বরং পুত্র ত্যাগ সম্ভব হইতে পারে, তবু ধর্ম্ম সমাজ ত্যাগ একেবারে অসম্ভব।

তাড়াতাড়ি কেমন শেণবিদ্ধ ভাবে উঠিয়া পড়িলেন। ঝিকে কহিলেন,—"তাহ'লে নরেন এলে ব'লো যে তোমাব পিতা এসেছিলেন তিনি ব'লে গেছেন আর যেন নরেন্দ্র দেশমুখো না হয়—তাকে তিনি ত্যাজ্য পুত্রই ক'রে গেছেন, যে পুত্র বিধবাকে বিয়ে কর্‌তে পারে সে যে তাঁর পুত্র নয় এসব স্পষ্টই বল্‌বে, তার বিধবা নিয়ে ঘর সংসার চলুক, পিতার স্নেহে তার দরকার কি?" বলিতে বলিতে তাঁর অশ্রুউদ্বেল চক্ষু দুটি হইতে আগুন ঠিক্‌রাইয়া পড়িতে লাগিল—

ঝি কহিল,—আপনিই এ সব কথা বল্‌বেন বাবু আমি কিছুই পার্‌বো না।

রাজশেখর কহিলেন,—পারবে না ?—

ঝি কহিল,—না—

রাজশেখর বাবু তখন ব্যাগ হইতে কাগজ ও পেন্সিল

বাহির করিয়া মুখে যাহা বলিয়াছেন তাহাই অগ্নিজ্বল ভাষায় লিখিয়া ঝির হাতে দিয়া বার বার সাবধান করিয়া দিলেন, যেন এ চিঠি নরেনের হাতে দিতে কিছুতে না ভুল হয়।

রাস্তায় বাহির হইয়াই তাঁহার মনে হইল, তিনি যেন এইবার সব হারাইয়াই চলিলেন।

নরেনের বাড়ীটার দিকে চাহিয়া মনে হইল, আর তাঁহাকে নরেন বলিয়া স্নেহভরা একটা হৃদয় লইয়া এ বাড়ীতে প্রবেশ করিতে হইবে না।

ধর্ম্মভ্রষ্ট সমাজ ত্যাগী পুত্র, তবু তার উপর এখনও এত মমতা? হায় রে পিতার হৃদয়! আর নিষ্ঠুর পুত্র পিতার মুখের দিকে চাহিয়াও কি এই সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে ক্ষান্ত হইতে পারিত না? একবার মনে করিলেন দেখিয়া আসি কোথায় বিবাহ হইতেছে কিন্তু তখনি বিধবা কথাটা মনে পড়িয়া দারুণ ঘৃণা উপস্থিত হইল; আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। ষ্টেশনে যখন উপস্থিত হইলেন তখন প্রাণটা বড় খাঁ খাঁ করিতে লাগিল।

হৃদয়ের বৃত্তিগুলা যেন বাঁধন ছিড়িয়া কেবলই নরেনের

বাসাভিমুখী হইতে চাহিল—হোক পুত্র হাজার দোষে দোষী, তবু পুত্রকে বিদায় দিতে কি পিতার হৃদয় পারে? তাঁহার মনে হইল যেন শয়তানেই অমন পুত্রের মতিবিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে, শয়তানটার টুটি চাপিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া কেহ কি পুত্রকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া দিতে পারে না? রাজশেখরবাবু তাঁহাকে হাজার টাকা পুরস্কার দিতে রাজী আছেন, কিন্তু কোথায় তেমন বীর? কোথায় বা শয়তান? কোথায় বা পুত্র! অস্তগমনোন্মুখ রবিরশ্মি যেন ব্যঙ্গ করিয়া একটা নিষ্ঠুর হাসি হাসিয়া রাজশেখরের নেত্র হইতে অন্তর্হিত হইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

রাজশেখরবাবুর বাড়ী আসিবার পূর্ব্বেই সমস্ত সংবাদ গ্রামময় রাষ্ট হইয়া গিয়াছিল যে, নরেন্দ্র বিধবা বিবাহ করিয়া বসিয়াছে।

রাজশেখরবাবুর বাড়ীতেও সে কথাটা বিবিধ বিচিত্র

ছন্দে, ঘোরাল রকম ভাষায় বর্ণিত হইয়াছিল রামীর মা, বামীর মাসি, ক্ষিরির পিসি এবং স্বয়ং ক্ষীরোদাও তাহাদের যতটুকু অভিজ্ঞতা ও কল্পনায় কুলায় প্রসন্নময়ীর কাছে, হিমানীর মায়ের কাছে, ও হিমানীর কাছে বলিয়া গিয়াছিল। বলিয়াছিল, তাহাদের বড় সাধে বালি পড়িয়াছে, নরেন আর তাহাদের নাই।

সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বলিয়াছিল ক্ষীরোদা—কারণ সেও ছিল বিধবা—এবং নরেন্দ্র যে সেই বিধবাকে বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছে এই লজ্জায় তাহার সর্ব্বশরীর কণ্ঠকিত হইয়াছিল। তাহারা যেই ভালো সেই ত গ্রামের মেয়ে হইয়াও ভাগ্যে ভাগ্যে নিস্তার পাইয়া গিয়াছে। নরেন্দ্র যেমন প্রকৃতির, তাহাতে ক্ষীরোদাকেও হয় ত একদিন বিবাহের কথা বলিয়া ফেলিতে পারিত।

এ পরিবারের সহিত যাহাদের একটুও ঘনিষ্ঠতা ছিল তাহারাই আহা আহা করিয়া সহানুভূতি দেখাইয়া গেল। আর গরীবের মেয়ে রাজরাণী হইবে বলিয়া যাহারা ফাটিয়া মরিতে ছিল তাহাদের আজ আর জল্পনা কল্পনার বিরাম নাই। ইতি মধ্যেই অনেকে নরেনের পিতাকে একঘরে করিবার কল্পনা করিয়াছে।

কিন্তু বাড়ীর একয়টি প্রাণী রাজশেখরবাবুর আগমন

পথ চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মা সুবচনীর কৃপায় যদি সু-খবর থাকে? তাই তাঁহারা মুখে একটি কথাও কহেন নাই। পিসিমাও না—পদ্মাবতীও না।

হিমানীও স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া সব কথা শুনিয়া যাইতে-ছিল, আর নীরবে দুফোটা চক্ষের জল মুছিতেছিল। কখনও আকাশের দিকে চাহিয়া বলিতেছিল, এ কথা যদি সত্য হয় তবে হে ঠাকুর! সত্যই যেন হিমানী ম'রে যায়।

আবার এক একবার অপরাহ্ন দিনের সেই কথাটা মনে পড়িয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেছিল, ভাবিতেছিল এও কি সম্ভব হ'তে পারে? তিনি যে বলিয়াছিলেন, এই আমাদেব বিয়ে, লোকের এটা গুজব বলিয়া কথাটাকে চাপা দিতে যত চেষ্টা করে, কিন্তু কথাটা কেমন সন্দেহের খুঁৎ লইয়া একটা দুঃস্বপ্ন হইতে আর একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে তলাইয়া যায়। তখন হিমানী ব্যাকুল হইয়া জানলার গরাদের ধারটাতে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলে আর ব্যাকুল হইয়া নিজের অজ্ঞাতে বলিয়া বসে ওগো এসো তুমি। এক-বারও তুমি এসো, তুমি আমায় না গ্রহণ করো—একবার শুধু বিবাহটা ক'রে যাও, আমাকে কুমারী জীবন হ'তে অব্যাহতি দাও। যে জীবনে শুধু তুমি আছো সে জীবনে

শুধু তোমারই অধিকার অক্ষুণ্ন রাখ, আমায় উদ্ধার কর, জীবনে তোমাকেই ভাবিতে শিখিয়াছি! তোমাকে ভাবিতে ভাবিতেই আমায় মরিবার অধিকার দাও!

নরেন্দ্র কাছে থাকিলে হয়ত যেমনটি বলিতে পারিত তেমনই ব্যাকুল হইয়া লুটাইয়া বলিতে লাগিল।

অবলা বালিকা,—তাহার বাহিরে ফুটিয়া কাহাকে কিছু বলিবারও যে সাধ্য নাই। শুধু ক্রন্দন! আর ক্রন্দন!

রাজশেখরবাবু বাড়ী পৌছিতেই প্রসন্নময়ী ও পদ্মাবতী দুজনেই ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা হ'লে কি কথাটা সত্যি, যে নরেন—।" রাজশেখরবাবু অশ্রু অবরুদ্ধ স্বরে কহিলেন, "সত্যই, সে নরেন আমাদের আর নাই, সে পর হ'য়ে গেছে, শয়তানে পর ক'রে দিয়েচে, আমি তাকে উদ্ধার করতে পারলাম না।" বলিতে বলিতে তাঁহার দুই চক্ষু হইতে ফোঁটা ফোঁটা উষ্ণ অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অন্ধকার দেখিলেন পদ্মাবতী, তিনি যে তাঁহার কন্যাটি লইয়া বিবাহ দিতে এ বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার এত আশার পরিণাম কি এই হইল?

বেদনার প্রথম ধাকাটা অতিবাহিত হইয়া গেলে পদ্মাবতী অপরাহ্নে রাজশেখরবাবুর গৃহে উপস্থিত হইলেন।

রাজশেখরবাবু তখন সবে নিদ্রা হইতে একটা দুঃস্বপ্ন-ভার চিত্ত লইয়া জাগিয়া বসিয়াছিলেন। পদ্মাবতীকে দেখিয়াই তাঁহার আগমনের কারণ বুঝিতে পারিলেন।

পদ্মাবতীই একহাত ঘোমটার ভিতর হইতে লজ্জার মাথা খাইয়া কহিলেন,—তাহ'লে বেহাই আমার হিমানীর গতি? আপনিই ত এনেছিলেন আশা দিয়ে?

রাজশেখরবাবু কহিলেন,—সে কথাটা আমি আবার দুপুরবেলা ভেবেছি বেহান, হিমানীকে যখন এনেছি তখন তার কথা আমার বেশই মনে আছে, তাকে যখন একবার মা বলেছি তখন নিশ্চিন্ত থাকুন। পাত্রের অভাব কি? বিপিনের ছেলে শশী, সেও ত নিন্দের নয়।

পদ্মাবতী ঘোমটার ভিতর হইতে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন,—তাই যা হোক, আপনি একটা গতি করুন। নরেন্দ্রকে ত জামাই ব'লে মনের খেদ মিটুতে পার্‌লাম না। সে ভাগ্য ত হ'লো না।

নরেন্দ্রের নাম হইতেই রাজশেখরবাবুর বুকের ভিতরটা কেমন মোচড় দিয়া উঠিল। কহিলেন,—এখনও সে যদি এসে বলে আমি বিধবাকে ত্যাগ করব। তা হ'লে তাকে

পুনরায়, হিমানীর সঙ্গে বিয়ে দিয়েই যে পুত্র সেই পুত্র ক'রে নিতে পারি।'

পদ্মাবতী আগ্রহভরে কহিলেন, তাই দেখুন না বেহাই, যদি হারানিধি আবার ফিরে পাওয়া যায়।

রাজশেখরবাবু কিছু চিন্তিতস্বরে কহিলেন,—সে উপায় বুঝি আর নাই, অদৃষ্টে তার দুঃখ আছে—কে ঘোচাবে বলো —তবু আমি নবীন বাঁড়ুয্যেকে বলে এসেছি, বিষয়ের লোভেও যদি এখনও আপনাকে সম্বন্ধে ন্যায়, কিন্তু তাতে মত দেবে বলেই বোধ হয় না। নাই আসুক সে।— হিমানীর খাওয়া পরার সংস্থান আমি ক'রে যাবোই।— সেজন্য আপনি কোন চিন্তা করবেন না—

পদ্মাবতী অশ্রুস্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন,—আপনিই ত তাকে দয়া ক'রে—দুঃখের মরুভূমি হ'তে তুলে এনে রাজরাণী করবেন ব'লে আশা দিয়েছিলেন—কিন্তু দুঃখিনীর মেয়ের কপালে এতটা সৈবে কেন? তবু তার কথা আপনি যে এখনও ভাবছেন তাই তার ভাগ্য বলতে হবে।

রাজশেখরবাবু কহিলেন,—যান, কোন চিন্তা করবেন না—আমি আজই বিপিন বোসকে ডাকতে পাঠাবো, সে সম্ভব আমার কথা ঠেলতে পারবে না, তাদের যদি টাকা নিয়েও অমত হয়, তাদের আশার অতিরিক্ত আমি দিতে পারবো।

বলিতে বলিতে তাহার স্বরটা কেমন উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এবং সেই অবস্থাতেই চটিটা পায়ে দিয়া বাহিরের তোষাখানা ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

হিমানী কখন পেছন দিক হইতে বাহিরের রোয়াকে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। রাজশেখরবাবু চলিয়া যাইতে পদ্মাবতীর কাছে আসিয়া মায়ের অঞ্চলটা চাপিয়া ডাকিল মা।................

পদ্মাবতী মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া একবারে শিহরিয়া উঠিলেন। সে সুষমাভরা মুখে প্রাণের একটা হিল্লোলও নাই। যেন কোথা হইতে একটা দুঃসহ ব্যথা আসিয়া তাহার কোমল বক্ষঃস্থলটুকু ভাঙ্গিয়া দিয়া গেছে।

মা স্নেহভরে কন্যার মাথায় হাত দিয়া কহিলেন,—তুই ভাব্‌ছিস্‌ হিমানী, তা তোর এত ভাব্‌না কেন? বিয়ে ওখানে না হয় একজায়গায় ত হবেই—

হিমানী অশ্রু অবরুদ্ধ স্বরে মায়ের হাতটী চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—দোহাই মা, আমার আর কোথাও বিয়ের-কথা তোমরা কোয়ো না। শুনেছি কুলীন বামুনের ঘরে মেয়ে ত চির কুমারী ও থাকে, আমি না হয় তাই থাক্‌বো।— কিন্তু—আমি আর—

মাও কন্যাকে বুঝাইতে পারিলেন না, তাঁহার দুই চোখে

জলে ভরিয়া আসিল। কি বুঝাইবেন তিনি, যদি হিমানী নিতান্ত বালিকা থাকিত, তবে কোন কথাটি কহিতে হইত না। কিন্তু আজ যে সে তার সর্ব্বস্ব এখানে বিসর্জ্জন দিয়া রিক্ত হইয়া ফিরিয়াছে, সে যে বুঝিয়াছে, তার স্বামী, তার ইহকাল পরকালের দেবতা। হায় নরেন্দ্র বুঝিলে না, কিন্তু একদিন তোমায় এই রত্নের জন্য হয়ত অনুতাপ করিতে হইবে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্রনাথ বিধবাকে বিবাহ করিয়া যখন বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন চারিদিকে ভারি একটা কলরব পড়িয়া গেল।

ইতিমধ্যেই সংবাদটা সহরের মধ্যে নানা আকারে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল, তাই নরেন্দ্রনাথ নববধূ লইয়া বাসায় পৌঁছিতে নব্যদলের মধ্য হইতে প্রবল একটা উৎসাহ গীতি উৎসারিত হইয়া উঠিল। যেন তাঁহারা রোমসাম্রাজ্য জয় করিয়াই ঘরে ফিরিয়াছেন। দু একজন উদ্যোগী মহাশয় বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে খানিকটা লেক্‌চারও চালাইয়া গেলেন এবং আদর্শ পুরুষ নরেন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া নব্য

বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সাধারণকে অবহিত হইতে উপদেশ দিলেন।

এসব কোলাহলের মধ্যে কিন্তু নরেন্দ্রনাথ ছিল না। বুড়ি ঝিটীর কাছ হইতে পিতা যে আসিয়াছিলেন, সেই খবর লইয়া তাঁহার প্রদত্ত পত্রখানা দেখিতেছিল।

একবার দুইবার তিনবার পড়িয়া বুঝিল তাহার সে সংসারের সহিত এবং পিতার সহিত সব সম্বন্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে।

ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিল। খানিক স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া রমাকান্তকে পত্রখানা দেখাইল।

রমাকান্ত খানিক চুপ চাপ থাকিয়া তারপর নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া কহিল, "তুমি তোমার কর্ত্তব্য ক'রেছ। পিতা যদি বিনাদোষে ত্যাজ্যপুত্র করেন, তা হ'লে তোমার ত আক্ষেপ করবার কিছুই নাই। তুমি ত তোমার পিতার চরণে সেই পুত্রই আছ।"

"আছি,—কিন্তু"

"কিন্তু—কি নরেন্দ্র?"

"পিতার অবাধ্য হ'য়েছি. ছেলেবেলা হ'তে আমার মা ছিল না, সেই বাবা আমার মাতার স্নেহেও পালন ক'রে-ছিলেন, তাই কাজটা বোঝলাম্ না হঠাৎ—"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

"এখন আক্ষেপ বৃথা"।

"হাঁ আমি তা তখনই বুঝেছি।"

রমাকান্ত কহিল, "যুদ্ধ করো বন্ধু, লোকাচারের সঙ্গে—সমাজের সঙ্গে—দুঃখের সঙ্গে—দৈন্যের সঙ্গে বীরের মত যুদ্ধ করো, আর সেই যুদ্ধে জয়লাভ করো।

*　　*　　*　　*

রাত্রির বেলায় পাড়ার জনকতক আসিয়া ফুলশয্যাব আয়োজন করিয়া দিয়া গেল। রমাকান্তের স্ত্রীও ইহাতে কম সাহায্য করে নাই। একটা গোড়ে বেলফুলের মালা স্বহস্তে গাঁথিয়া রাখিয়া নরেন্দ্রকে বাড়ীর মধ্যে ডাকিয়া পাঠাইল।

পিতার পত্রটা পাইয়া অবধি নরেন্দ্রের অন্তঃকরণটা কেমন জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল। জুড়াইবার যতই আয়োজন করিতেছিল, সব নিষ্ফল হইয়া যাইতেছিল। এমন সময় অন্তঃপুরের আহ্বানটা তাহার নেহাৎ মন্দ লাগিল না, ভাবিল সমাজ, সংসার পিতা স্থান না দিলেও সেখানে সে আশ্রয় পাইবে, যেখানে তার সব দুঃখ সহানুভূতির অশ্রুসেকে অমৃত হইয়া যাইবে।

উদ্বেলিত হৃদয় লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

সে বইয়ে পড়িয়াছিল, স্ত্রীর অন্দরে প্রবেশ করিবার সময় সংসারকে বাহিরে রাখিয়াই আসিতে হয়। তাই সে প্রথম সন্দর্শনেই গীতগোবিন্দের কয়েকটা শ্লোক আওড়াইয়া ফুলের মালাটা স্ত্রীর কণ্ঠদেশে জড়াইয়া দিল।

স্ত্রী কিন্তু লজ্জায় জড়সড় হইয়া খাট হইতে নীচে নামিয়া পড়িল। মালাগাছটিও সে গলায় রাখিতে পারিল না।

নরেন্দ্র কহিল,—"একি তোমার মণিহারের চাইতে কম মূল্য ভেবেছ? নির্ম্মলা, অনুরাগের কষ্টিপাথরে এ হারকে পরখ ক'রে নিও!"

স্ত্রী একটু বয়স্থা বলিয়াই প্রথমে এতটা বলিতে সাহস করিয়াছিল।

নির্ম্মলা কিন্তু কোন উত্তর করিল না। বরং অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে তাহার অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

নরেন্দ্র ভাবিল নবাগতার এটা স্ত্রী-সুলভ লজ্জা কিম্বা মোহিনী নারীর এটা এক রকম ভালবাসার পূর্ব্বরাগের অশ্রু।

নরেন্দ্র নির্ম্মলার হাতটা চাপিয়া মুখটা মুছাইয়া দিয়া কহিল, "এ ঘর কি তোমার মনে ধরে নাই অবলে? কিন্তু তার জন্য ত আমরা মিলিত হই নাই! নারী, আমাদের

"বিবাহ যে জগতের দুঃখভার বইবার জন্য,—পরস্পরের সাহায্যার্থে একটা অটুট প্রেমবন্ধন।"

নির্ম্মলা নরেন্দ্রের হাতটা সরাইয়া আস্তে আস্তে সরিয়া দাঁড়াইল। তারপর ধরাকণ্ঠে কহিল,—"আমি মিনতি ক'চ্ছি, আপনি আমায় স্পর্শ করবেন না।"

নরেন্দ্র বিস্মিত হইয়া নির্ম্মলার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, সে মুখে ত বালিকার কাতরতা নাই অথচ এরূপ পরুষ স্বর কেন?

সোৎসুকনেত্রে কহিল,—"কেন? তুমি কি আমার স্ত্রী নও?"

নির্ম্মলা স্পষ্ট কহিল,—"নই!"

নরেন্দ্র। তবে এই বিবাহ?

নির্ম্মলা। বিবাহ নয়, এটা একটা জোচ্চুরি, আমার ভাইদের টাকা উপায়ের জন্য একটা ষড়যন্ত্র!

ষড়যন্ত্র? নরেন্দ্রের মনে হইল যেন তাহার অঙ্গ বাহিয়া একটা ঘৃণ্য সরীসৃপ তাহাকে গ্রাস করিতে চাহিতেছে, শিহরিয়া পিছাইয়া গেল। কিন্তু কথাটা শেষ করিতেও ভুল করিল না, কহিল, "তাহ'লে তোমার এ বিবাহে কোন সায় ছিল না?"

নির্ম্মলা। একবারেই যে ছিল না তা নয়, কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি এখন বুঝছি!

নরেন্দ্র। এখন কি বুঝ্‌ছো ?

নির্ম্মলা। এখন বুঝ্‌ছি যে হিন্দু নারীর দুবার বিবাহ হয় না।

নরেন্দ্র। তবে রাত্রে যখন পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে, লোহা সিঁদুর নিয়ে তোমার কাছে এসেছিল তখন কথাটি ত কহ নাই।

নির্ম্মলা। তখন আমার নেশা কাটে নি চক্ষে দেখ-ছিলাম, স্বামী পুত্র সংসারের একটা ছবি।

নরেন্দ্র। আর আজ ?

নির্ম্মলা। আজ কেবল ধিক্কার! সকাল হ'তে যে দিকেই চাইছি, কেবলি মনে হ'চ্ছে চারিদিক হ'তে হাজার ধিক্কার ভেসে এসে, আমায় ধিক্ ধিক্ ক'রে যাচ্ছে।

নরেন্দ্র। তাই আমায় ছেড়ে যাবে—

নির্ম্মলা। হাঁ।

নরেন্দ্র। তবে আমি কার জন্য পিতার রোষ, সমাজের নিগ্রহ, মায়ের স্নেহ সব হারালাম ? আমার তুলনায় তোমার কি গেছে ? রাজার ঐশ্বর্য্য আমি হারিয়েছি !

নির্ম্মলা ধীরস্বরে কহিল,—প্রায়শ্চিত্ত করুন।

নরেন্দ্র। ঠিক ব'লেছ। হায় নারী দেবী হ'তেই তুমি জন্মেছিলে ! তোমায় কামনার এ নরককুণ্ডে কে টেনে

এনেছিল ? আচ্ছা থাকো যদি প্রবৃত্তিতে না কুলোয়—আমি ফিরেই চল্লাম। নরেন্দ্র ঘরের দরজাটা টানিয়া দিয়া বাহিরে আসিতে উদ্যত হইল, নির্ম্মলা কহিল, "শুনুন।"

নরেন্দ্র কহিল, "কি !"

নারী তাহার অবগুণ্ঠন ঈষৎ উন্মোচন করিয়া অসাবধানে একটু খানি রূপের ঝিলিক এলাইয়া কহিল. "দেখুন। আমি পূজারিণী, পূজাই আমার ব্রত।"

নরেন্দ্র কহিল, "বেশ। পূজা নিয়েই থেকো।" কিন্তু সে এই অপূর্ব্ব পূজারিণীর দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল—তাহার নয়ন বাঁধিয়া গিয়াছিল—

নারী কহিতে লাগিল, "আমি কিছুই চাহি না শুদ্ধ পূজাচারিণীর থাকিবার মত একটু ঠাঁই। যে কদিন আপনার আশ্রয়ে থাক্‌বো এই অনুগ্রহ টুকু পেলে কৃতার্থ হ'য়ে যাবো।

নরেন্দ্র ভাবিল—এ আর বেশী কিছু নয়, কিন্তু কেন ? আবার নিজের উপরে নিজের এ পীড়ন কোন প্রয়োজনে ? এতদিন ত সমাজ, তাহার বুকের উপরে—পাথর চাপাইয়া ছিল, সে পাথর একটু সরিয়া যাইতে সাধিয়া আবার সেই মৃত্যু বর কেন মাগিয়া লইতেছে, আর্ত্তনাদ করিবার সামর্থ্যটুকু ও যাহাতে বিলুপ্ত হয় ?—সমস্ত জীবনখানি মরু ভূমের

তপ্ত বালুকায় শুকাইয়া কি লাভ ? কে বলিবে তাহার লাভ কি অলাভ ? কিন্তু সে ইহাই চায়—যে আলোক যে বাতাস সে পাইয়াছিল, আবার তাহা ফিরাইয়া দিয়া জীবনের রাজ্য হইতে মরণের কোলেই ঢলিয়া পড়িতে চায়, হউক ব্যর্থ—রূপ—কিন্তু সঙ্গিনীদের ধিক্কার হইতে সে উত্তম ! তিলে তিলে মৃত্যু ভালো, তবু বিধবার সৌভাগ্য কিছু নয়।

নরেন্দ্র কহিল,—"তাহলে বিধবা, পূজারিণী থাকাই তোমার অভিপ্রায়।

বিধবা কহিল,—"হাঁ।"

নরেন্দ্রের চক্ষের সম্মুখে নারীরূপের এক বহ্নিচক্র জাগিয়া উঠিল ! সে এমন মোহময়ী অগ্নি-চক্র যেন জীবনে লক্ষ্য করে নাই। কি অপরূপ নিরাক্তা !—বলিতে লাগিল।

"হে বহ্নিরূপিনী, হে মায়াময়ী, হে সুন্দরী, হে পূজারিণী, আমায় বলো তুমি কাহার পূজা করিবে ? কে তোমার পূজার অঞ্জলি গ্রহণ করিবে ? তোমার নিজের মধ্যেই যখন একটা স্তব মূর্ত্তি ধরিয়া আছে তখন বলো,—বলো মায়াবিনী, কোন্ মূঢ় তোমার পূজার অর্ঘ্য বহ্নিয়া আপনার পতঙ্গ-জীবন আহুতি দিবে ?"

সকাল বেলায় যখন রমাকান্ত আসিল, তখন নরেন্দ্র

-সকল কথা রমাকান্তকে খুলিয়া কহিল, "বন্ধু, ভাল মন্ত্রই শিখিয়েছিলে, কিছুই থাকলো না !"

রমাকান্ত কহিল—"সে নারী নিজের জীবনের মধ্যে দীর্ঘ মরুভূমি রচনা ক'রে কি শান্তি পাবে, এতই যদি তপস্বিনী থাকিবার সাধ তবে বিবাহের পূর্ব্বেই ত অস্বীকার করলেই পারতো নিতান্ত বালিকাটি ত ছিল না—

নরেন্দ্র। তোমরা নারীর হৃদয় নিয়ে ত নারীকে বিচার ক্ষেত্রে দাঁড় করাও নাই, নিজের হৃদয় দিয়েই তাদের বুঝতে চেয়েছিলে ?

রমাকান্ত। আমি ত এখন তার জন্য ভাবছি না, ভাবছি তোমার জন্য নিজের সুদীর্ঘ জীবন এই ভুল ভ্রান্তির মধ্য হ'তে কি করে পারে নিয়ে পৌছিবে ?

নরেন্দ্র। ফিরিয়ে নিয়ে যাও বন্ধু—তোমার মন্ত্র তন্ত্র, আমার রৈল কি ? ইহকাল পরকাল পিতা মাতা আমার বলতে সব গেল !—চাইনা এ সর্ব্বনেশে মন্ত্র। নিজের প্রাণই যদি খাক হয়ে গেল কি হবে কতকগুলো পরের প্রাণের বোঝা বয়ে, তারা ত আমার শুষ্ক পল্লবে রস ধারা ঢেলে উত্তরীয় দিতে পারবে না।—

রমাকান্ত নিজেও কোন সান্ত্বনার কথা কহিতে পারিল না—কারণ দেখিয়া শুনিয়া তাহার নিজের ভিতর হইতেও

কেমন একটা ভয় জাগিতেছিল সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতে ছিল না নরেন্দ্রকে কি করিয়া কূলে পৌঁছাইয়া দিবে এ যে তাহার সাধ্যাতীত। কিন্তু আশাই বা ত্যাগ করিবে কি করিয়া? উন্মাদনা শিরায় শিরায় তাহার মাদকতা ছুটাইয়া লইয়া চলিয়াছিল—শান্তিও ত জীবনের উপাস্য নয়। দুঃখ পাইবেও! যেমন দুঃখ দিবেও তেমন আবার মরিবেও ত তাহারা এই বিবাগীর দল। যুদ্ধ! যুদ্ধ! যুদ্ধ রমাকান্ত যুদ্ধ মৃত্যুকেই মনে মনে বরণ করিয়া লইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সকলের সকল ক্রন্দনের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন সান্ত্বনার কথা লুকায়িত আছে; কিন্তু পিসিমা প্রসন্নময়ীর তাহাও নাই। তাঁহার যাহা কিছু আশা মায়াবিনীই গ্রাস করিয়াছে পুত্রকে তিনি সে রাক্ষসীদের হাত হইতে আর ফিরিয়া পাইবেন না।

তাঁহার পৃথিবীর দিকে চাহিয়া মনে হয়, এই বসুন্ধরা যেন কতকগুলা নাগিনী, শঙ্খিনীই পালন করিতেছে; যাহারা বক্ষের মাণিকগুলা গ্রাস করিতে আপনাদের বিশ্ব গ্রাসী বদন ব্যাদান করিয়া আছে। সেই জন্যই হিমানীর

প্রাণেও তাঁহার আর সে আস্থা নাই। তাঁহাকে দেখিয়া বলে হতভাগিনী এন্তটুকু রূপের আকর্ষণ তোর ছিল না, যে আমার পুত্র তাতে বন্দী হ'য়ে ফিরে এলো। হিমানী কিন্তু পিসিমাকে লইয়াই আছে; তাঁহার আহার ও শয্যারচনা এই লইয়াই শোকের একটি স্নিগ্ধ ছায়াতলে বেদনাময়ী জননীর কাছে সে আপনাকে সমর্পণ করিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত আছে।

দাদাঠাকুর রামলোচন চক্রবর্ত্তী আসিয়া ডাকিলেন,—প্রসন্ন দিদি!

প্রসন্ন কহিলেন—কি দাদাঠাকুর, আজ না শিবশ্যামার ঘটে ফুল চাপাবেন ব'লেছিলেন, চাপিয়ে ছিলেন?

"সেই জন্যই ত সু-খবর দিতে এলাম।"

পিসিমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাদাঠাকুরের পায়ে ঢিপ করিয়া একটা প্রণাম করিয়া বসিবার আসনখানা পাতিয়া দিয়া কহিলেন—বসো দাদাঠাকুর, মা আমাদের পরে সদয়া হ'য়েছেন ত?

দাদাঠাকুর আসনটার উপর বসিয়া পড়িয়া কহিলেন—হঁা তোমাদিগকে কিন্তু ইয়ে করতে হবে। সামনের অমাবস্যায় শ্মশানকালীর পূজো দিতে হবে। তাতে মিস্‌কালো দুটি ছাগ, আর মায়ের চৌষট্টি যোগিনীর চৌষট্টি সিকার ভোগ

আর বুকের রক্ত আদছটাক। মায়ের সঙ্গে আমার কথা হ'য়েছিল ব'ল্লে হয়, আমি কাল সারারাত জপে ব'সে-ছিলাম। মা বলেছেন, এবার তোর নিশ্চয় হারানিধি ঘরে ফিরে আসবে।

পিসিমা আঁচল হইতে চাবির গোছাটি বাহির করিয়া হিমানীর হাতে দিয়া কহিলেন—নিয়ে আয়ত হিমানী আমার টাকার তোড়াটা, যত টাকা লাগে দাদাঠাকুর নেবেন।

দাদাঠাকুর দুর্গা দুর্গা বলিয়া কহিলেন—ও টাকা আমার হাতে না দিলেও পারো, যা ফর্দ্দ লাগে ক'রে দিচ্ছি, আমি বুকের রক্ত দিয়ে একবার পুজো ক'রে দেখ্‌বো।

পিসিমা আন্দাজ ৫০ টাকা বাহির করিয়া দাদাঠাকুরের সাম্‌নে রাখিয়া কহিলেন,—কি লাগে না লাগে জানি না দাদাঠাকুর। কিন্তু দেখো মাকে ব'লো যেন আর দুঃখ না দেয়! শ্বেতরৌপ্যের চক্রগুলি দাদাঠাকুরের চক্ষে সম্মুখে যেন কুবেরপুরীর কিন্নরীদের ওড়নার মত পেখম ধরিয়া নৃত্য জুড়িয়াছিল। দাদাঠাকুর তাহাদিগকে তিনি কুড়াইয়া লইতে ইতস্ততঃ না করিয়া খুব খানিক দীর্ঘশ্বা ফেলিয়া মহামায়া মায়ের সহিত চাক্ষুষ কথা কহিতে প্রতি-শ্রুত হইয়া এবং স্তোক বাক্যে পুত্র ফিরাইয়া আনিবা প্রতিশ্রুতি করিয়া সেখান হইতে রওনা হইলেন। পিসি

খানিকটা আশার আলোক পাইয়া উঠিয়া বসিলেন। এবং দুইবার পদ্মাবতী পদ্মাবতী করিয়া ডাকিয়া টাকার থলিটা হিমানীকে যথাস্থানে রাখিয়া আসিতে আদেশ দিলেন।

পদ্মাবতী আসিলে পিসিমা কহিলেন—"চলো দেখি আজ ভারত আচার্য্যীর ওখানে গণাতে যাবো, শুনেছি আমাদের এই পাশের গাঁয়েই তিনি এসেছেন, বাড়ীর কাউকে না জানিয়ে আমরা যাবো আর আস্‌বো।" পদ্মাবতীর তাহাতেও কোন আপত্তি নাই। পদ্মাবতী প্রস্তুত হইলেন। পিসিমা কহিলেন—"একবার শেষ ধন্না দিয়ে দেখ্‌বো, তারপর না পাই কাশী চ'লে যাবো। কিন্তু আমায় একবার কেউ যদি নরেনকে দেখিয়ে দিতো তবে যেমন ক'রেই হোক টেনে আন্‌তাম,কিন্তু তেমন ত কাউকে পাই না।" পদ্মাবতী চক্ষের জল মুছিলেন। জোর করিয়া চক্ষের জল রোধ করিয়া করিয়া হিমানীরও চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, সকলের শোক ভুলিবার উপায় আছে, কিন্তু তাহার শোক রুদ্ধ আর্ত্তনাদের মত কণ্ঠ পর্য্যন্ত আসিয়াই স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। রুদ্ধ জ্বালাকে বাহিরে প্রকাশ করিয়া দিয়া শোকের মধ্যেও সার্থকতা লাভ করিবার একটা অবসর নাই।

আজ একটু নিরালা পাইয়া কাঁদিতে বসিল। কহিল, এসো প্রিয়তম! আমায় না পায়ে স্থান দাও আমার

কুমারীজীবন হ'তে অব্যাহতি দাও! আমি সারা জীবন চক্ষের জল দিয়া তোমার পূজা করিব। শুধু আমার পূজার মন্দিরে নিশ্চিন্তে মরিবার অবসর দাও। যেন আমায় আর কাহারও দ্বারে অতিথি না হইতে হয়। নরেন্দ্র কাছে থাকিলে হয় ত যেমনটি বলিতে পারিত, তেমনি লুটাইয়া বিনাইয়া বিনাইয়া আপনার জীবনের সমস্ত কাহিনীগুলিকে চক্ষের জলে উৎসারিত করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

এমত অবস্থায় ক্ষীরোদা কখন তাহার খোঁজে আসিয়াছিল ও তাহাকে বার বার করিয়া ডাকিয়াছিল, তাহা সে শুনিতে পায় নাই। সহসা অসম্ভাবিত প্রকার এই দস্যু-সমাগমে হিমানী এঁকেবারে চকিত হইয়া উঠিল। সে জানিত, তাহার কাঁদিবার মূলে এতবড় হিংস্রক আর কেহ নাই। তাই সে যথাসম্ভব সংযত হইয়া চক্ষু মুছিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল।

হিমানীর কোন কথা কহিবার পূর্ব্বেই ক্ষীরোদা একটা ভরা উচ্ছ্বাস লইয়া হিমানীর কোলের কাছটায় ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল,—আমি তোকে একটা সুসংবাদ দেব ব'লেই এসেছিলাম হিমানী, সে এত বড় সুসংবাদ যে কি বল্‌ব, ভাই, আর চেপে রাখ্‌তে পার্‌লাম না, ছুটে চলে এলাম, আমার রাগ অভিমান সব ভেসে গেল!

সু-খবরের নামটি শুনিয়া হিমানীর বুকটা যেন কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, যদিও তাহার আশা করিবার কিছুই ছিল না, তথাপি যদি কিছু সংবাদ থাকে, এই ভাবনায় তাহাকে জাগিয়া উঠিতে হইল। ক্ষীরোদার দিকে এক করুণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিপাত করিয়া বসিয়া রহিল; কিন্তু কি উত্তর দিবে ক্ষীরোদা—এই ভাবনায় তাহার বুকটাও ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল।

ক্ষীরোদা অনেকখানি হাসিয়া অনেকখানি গলিয়া হিমানীর গলাটা জড়াইয়া কহিল,—সে ভাই বড় প্রাণের কথা! সে কথা বল্‌তে সুখ, শুন্‌তে সুখ,—সে কথা যেথানে হয় মনে হয় সেখানে সারাদিন না খেয়ে না দেয়ে পড়ে থাকি, আর ওই কথাই শুনি।

হিমানী অসাড় হইয়া উঠিতেছিল; কহিল,—না বলো ত চলে যাও, আমি এত ফের ফাঁপর বুঝি না, সোজা ব'লবে ত ব'লে যাও, বলিয়া উঠিয়া পড়িল।

ক্ষীরোদা তবু হিমানীর গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া রহিল। কহিল,—এত রাগিস্ কেন ভাই! আচ্ছা হিমানী আমি যদি তোর "যা" হই, তা হ'লে তোর আমাকে "যা" বলে মনে ধ'র্‌বে তো?

হিমানী অবাক্‌বিস্ময়ে ক্ষীরোদার মুখের দিকে

চাহিয়া রহিল, যেন কথাটা সে কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না।

ক্ষীরোদা হাত নাড়িয়া বুঝাইয়া দিয়া কহিল,—এই "যা" বুঝতে পাচ্ছ না, তোমার শ্বশুরঘরের দেওর কি ভাসুরের পরিবার! এইবার বুঝেছিস্, তা হ'লে হিমানী তুই আমার কত আপনার হবি!

হিমানী তথাপি কথাটা ভাল বুঝিতে পারিতেছিল না। এক একবার ক্যাল ফ্যাল করিয়া ক্ষীরোদার মুখের দিকে চাহিতেছিল, আর একবার নীচের দিকে মুখ করিয়া কি ভাবিতে ভাবিতে কথার খি হারাইয়া ফেলিতেছিল।

ক্ষীরোদা কহিল,—তবে শোন্, শশী ঠাকুরপোর সঙ্গেইত তোর বিয়ের কথা হ'চ্ছে? শশী বাবু আমার সম্পর্কে দেওর হয় না, ওঁয়ার নিজ মামাতো ভাইএর পিসের ছেলের সঙ্গেই আমার বিয়ে হয় না—ওয়া ত এখন মাতামহ বিষয় পেয়ে এখানেই র'য়েছে—আগে ত ওঁদের এখানে বাড়ী ছিল না—

হিমানী এতক্ষণে সবটা বুঝতে পারিল, শশী নামটা ইতিপূর্ব্বে আর একবার তাহার কাছে হইয়া গিয়াছে, আবার ক্ষীরোদা সুদ্ধ যখন সেই শশীর প্রতিধ্বনি করিল, তখন হিমানী বুঝিল—শশীর কাছে তাহাকে পাকড়াও

হইতেই হইবে। তা সে শশী হৃদয়াকাশে কি নীলাকাশে যেখানেই উদিত হউক।.........

হিমানী কোন উত্তর না দিয়া নতমুখে হাতের নখ খুঁটিতে লাগিল। নরেন্দ্রের সহিত হিমানীর বিবাহের সম্বন্ধটা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ক্ষীরোদা মনে মনে ভারি আরাম পাইয়াছিল, গরীবের মেয়ের এতটা সুখ হইবে, এটা যেন তাহার কিছুতেই সহিতেছিল না, তাই হিমানীকে দেখিলেই তাহার বুকটা কেমন ঈর্ষ্যায় জ্বলিয়া উঠিত। আর যেমন তেমন নরেন্দ্রনাথ নহে, নরেন্দ্র বাবু—জমিদার-পুত্র—নারীর আকাঙ্ক্ষা করিবার মত সুপুরুষ!

উপস্থিত সে কথাটা কাটিয়া গিয়া যখন ঘরের কাছের শশিভূষণের সহিত সম্বন্ধের সূত্রপাত হইল, তখন ঈর্ষ্যা সহানুভূতিতে ও সখীত্বে গলিয়া গিয়া হিমানীর অঙ্গে ঢলিয়া পড়িয়া কহিল,—সত্যি বল্ না ভাই পছন্দ হ'চ্চে কি না তোর কাছ হ'তে আমার তা শুন্‌তে বড় সাধ যায়, কেন শশী ঠাকুরপোটীও ত বেশ—খুব লেখা. পড়া নাই জানুক, আমার ত মনে হয়, তবু নরেন বাবুর চেয়ে ঢের ভালো, নরেনবাবু যতই বিদ্বান হোক, বিধবাকে বিয়ে ক'র্‌লেন। হেঁইমা, যে কথা শুন্‌লে প্রাচিত্তি ক'র্‌তে হয়। বলিতে বলিতে তাহার স্বর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। যেন নরেন্দ্রই

তাহাদের মত বিধবাদের শুভ্রশান্ত তপোবনে দাবানল জ্বালাইয়া দিয়াছে। নিজের নাককাণটা মলিতে মলিতে কহিল,—জন্ম জন্ম বিধবা হ'য়ে থাকি সেও ভাল, তবু যেন কাণ শোনে ত চোখ না শোনে, চোখ শোনে ত কাণ শোনে না, ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা! সেই বিধবাটাই বা কি ব'লে লাজলজ্জার মাথা খেয়ে নরেনবাবুকে বিয়ে ক'র্‌লে! মরণ! ঐহিক সুখটাই কি এত বড় হলো তার? ক্ষীরোদা আপন মনেই অজস্র বকিয়া যাইতে লাগিল। হিমানী আর তাহার কথায় কাণ দিল না।

যে হেতু ক্ষীরোদা নিজে ছিল বিধবা, এবং মুখের কথাও অনেক সময় অন্তরের চেহারাটাকে সম্পূর্ণ আড়ালে রাখিয়া শিখণ্ডীর মত স্বকার্য্য সাধন করিয়া থাকে বলিয়া বাহিরের জগৎ তাহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিল। কারণ সত্য যে তখন শরশয্যাশায়ী।

এই কারণে যখনই বিধবা বিবাহকারীদের কথা উঠিয়াছে, তখনই ক্ষীরোদার ভিতর হইতে এমন একটা স্বর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, বাহির হইতে যেটাকে ধিক্কার ছাড়া আর কিছু বলা অন্যায় হইবে। কিন্তু তাহার অন্তরের নারীপ্রকৃতি মুখোস্ খুলিয়া একেবারেই আপনাকে উন্মুক্ত করিয়া দিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছে, ওগো আলো

দাও, বাতাস দাও! মানুষকে মানুষের মত বাঁচিবার শক্তি দাও।

তথাপি ক্ষীরোদা সমাজে সতীই ছিল এবং ক্ষুধাতৃষ্ণা-গুলা ক্ষুধিত শ্মশানকুকুরের মত তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে লেলিহান রসনা মেলিয়া চলিলেও সে আপনাকে বাঁচাইয়া চলিত।

মুখটি তুলিয়া কাহারও পানে চাওয়া তাহার অভ্যাস ছিল না। সে যে বিধবা, সে যে তপশ্চারিণী ব্রহ্মচারিণী বিধবা, এইটাই তাকে একটা পরম গর্ব্বের অধিকার দান করিয়াছিল। সে অল্প বয়সেই হাতের বালা চুড়ি খুলিয়া ফেলিয়াছিল, বাপ মায়ের অনুরোধে থান কাপড়টা যদিও এখনও পরিয়া উঠিতে পারে নাই—তবে শীঘ্রই যে তাহা পারিবে তাহাতে কাহারও সন্দেহমাত্র ছিল না। লোকে বলিত ক্ষীরোদার কি নিষ্ঠা, কি আচরণ, একাদশীর দিনে একগণ্ডুষ জলও মুখে দেওয়া নাই।

ক্ষীরোদা একদিকে লোকসমাজে তাহার সতীত্বের ধর্ম্ম আর একদিকে তাহার জীবনটাকে সার করিয়াছিল, এই পিপাসায় শুষ্কতালু হইলেও একটি দিনের জন্য চীৎকার করে নাই, বা কাঁদে নাই। অথচ যে স্বামীটির জন্য তাহার কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন, সে স্বামীটিও স্মৃতিপট হইতে

অনেক দিন মুছিয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে সত্য যাহা ছিল, তাহা শুধু ব্রত নিয়ম কৃচ্ছ্রসাধন মাত্র, আর তপস্যা যাহা ছিল, তাহা আপনাকে পীড়ন মাত্র, এই জন্য দিনের পর দিন তাহার মরুভূমি বাড়িয়াই চলিয়াছে, দূর দিগন্তের কোলে কল্পনার একটা পুণ্য তীর্থও তাহার জন্য নাই—যেখানে তাহার জীবনের সমস্ত গ্লানিমা চক্ষের জলে সিক্ত করিয়া দেবতার চরণে ঢালিয়া দিতে পারে। সেই জন্য সে যত দূর তাকায় দেখে কেবল মরুভূমি—ধূ ধূ বালু প্রান্তর!

—————

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্রের সহিত নির্ম্মলার মিলন আর হইল না। এত-দিন কাটিয়া গেল, তবু একটি দিনের জন্য তাহার হৃদয়-দ্বারের কাছে একবার প্রবেশাধিকারও পাইল না। যেন সে দেবী, ঊর্দ্ধাকাশের জ্যোতির্ম্ময়ী নক্ষত্র,—পদতলে বিশ্ব সংসার তার গ্রাহ্যের মধ্যেই নয়। যেন সে সাতমহল দেউড়ীর মধ্যে মহারাণী আর দুয়ারে নরেন্দ্রনাথ সামান্য দ্বারবানমাত্র, রাণীর সহিত পরিচয় রাখিবার স্পর্দ্ধাও তাহার নাই। ঝি-ই সকালে বিকালে যাহা কিছু খবর শুনাইয়া

যায়। সে শোনে কোন দিন রাণী বিল্বদল লইয়া দেবতার পূজা করিয়াছে, কোন দিন গঙ্গাজলেই পূজা সারিয়াছে, এ কোন্ কল্প-লোকের আলোক লতা—যাহাকে ছিঁড়িয়া বিসর্জ্জন দিবারও উপায় নাই ?

নরেন্দ্র দেখে কোন দিন রাণীজীর কাপড় বাহিরের বারান্দায় শুখাইতেছে। এক এক দিন কখনও চকিতে রাণীজীর গৌর তনুলতাটি জানালার ফাঁকে বিদ্যুদ্দীপ্তির মত চকিত হইয়া উঠে। হৃদয়ে একটা অপূর্ব্ব রণণের সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া হৃদয়েই মিলাইয়া যায়, বাহিরের জগৎকে আপনার ব্যথা জানিতে দেয় না। নরেন্দ্র বলে, সে একাই দায়ী, একাই সে তাহার জীবনের সমস্ত জটিল ঘটনাজাল হইতে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হইয়া ঘটনাবিহীন শান্তির রাজ্যেই বিশ্রাম লইবে। লেখা পড়ার বালাই নাই, চুকিয়া গিয়াছে, হাতের টাকা পয়সা যাহা ছিল, তাহাও শেষ হইয়াছে, এখন তাহাকে প্রতিদিন কঠোর জীবনসংগ্রামের ক্ষেত্রে দাঁড়াইতে হইবে। নরেন্দ্র এই বাস্তব জগতের মরুপ্রান্তরে দাঁড়াইয়া শিহরিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু পেছন ফিরিয়া পলাইবারও সে সুযোগ আর নাই। গাড়ীর চাকা তাহাকে অনেক দূরে ঠেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

এমন সময় একদিন রাস্তায় গ্রামের নবীন বাঁড়ুয্যের

সহিত সাক্ষাৎ হইল, বন্দ্যোপাধ্যায় তাহাকে সমস্ত শুনাইয়া কহিলেন, পিতা রাজশেখর তাহাকে ত্যাজ্য পুত্র করিয়াছেন এবং অর্দ্ধেক সম্পত্তি হিমানীর নামে রাখিয়া বাকী অর্দ্ধেক দেবসেবার জন্য দিয়া তিনি কাশীযাত্রা করিবেন। নরেন্দ্রের বুক হইতে যেন একটা পাষাণের বোঝা নামিয়া গেল। বিষয় বিষয় করিয়া যে একটা আবর্ত্ত সর্ব্বদা তাহার মধ্যে পাক খাইয়া বেড়াইত, সেটার দায় হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া আপনাকে অনেকটা খোলসা অনুভব করিল। কহিল,"হিমানীর বিবাহও কি হয়ে গেছে ?" নবীন কহিলেন "হাঁ, এই পাড়ার শশিভূষণের সঙ্গেই হয়ে গেল, এই ক'দিন মাত্র হ'য়ে গেছে।" শশিভূষণ? বলিয়া নরেন্দ্র থামিয়া গেল,সে যেন স্বপ্নে, না আর কোথাও শুনিয়াছিল, শশিভূষণের সহিত হিমানীর বিবাহ হইবে। কিন্তু আপনাকে ঠিক বিশ্বাস করিতে দেয় নাই। কারণ যে শশিভূষণ জীবনে তাহাদের দোষ অনুসন্ধান ছাড়া আর কিছুই করে নাই—সেই শশিভূষণ যখন হিমানীর হৃদয়বিহারী হইল, তখন আক্ষেপ করিবারও কিছুই নাই।

বন্দ্যোপাধ্যায় কহিলেন,—আমরা সব কর্ত্তাবাবুকে কত অনুরোধ কর্‌লাম, বল্লাম, নরেন্দ্রের মায়ের নামের বিষয়টা, নরেন্দ্রের থাক্, কিন্তু তাঁর যেন কেমন গোঁ বেঁড়ে গেল,

ব'ল্লেন, আমার ধর্ম্মত্যাগী পুত্র, বরং হত্যাকারীর আমার কাছে আশ্রয় আছে, তবু ধর্ম্মত্যাগীর আশ্রয় নাই!

নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিবার মত আর কোন কথা হাতের কাছে খুঁজিয়া পাইতেছিল না, খানিকক্ষণ মাথা চুল্‌কাইয়া কহিল,—তা হ'লে পিসিমা বেশ ভাল আছেন ত?

বন্দ্যোপাধ্যায় কহিলেন—হাঁ! তবে তাঁর শরীরও না কি ভেঙ্গে গেছে, তিনিও কাশীযাত্রা ক'র্‌বেন। তবে এখনও সব বিষয় আশয়ের বন্দোবস্ত না ক'রে কারও যাওয়া হবে না। তা বলি বাবা নরেন্দ্র! বিধবাবিবাহটা ক'র্‌লে কোন্ হিসেবে? জাতবেজাতের সঙ্গে খাও দাও তাতে ততটা আসে যায় না, কিন্তু এই বিধবার সঙ্গে বিবাহ একি হিন্দুসমাজে চলে?

নরেন্দ্র কহিল,—চলে কি না চলে এতটা ভেবে দেখিনি, তবে সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় তার যে প্রয়োজন আছে, এই ভেবেই বিবাহ করেছিলাম, ভেবেছিলাম, আমার দ্বারা যদি একটা জীবনেরও কিছু সুখশান্তি আসে।

বাঁড়ুয্যে কহিলেন,—এখন বেশ সুখী হ'য়েছো ত নব-পরিণীতাতে?

নরেন্দ্র সে কথায় কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না, সুখী কি দুঃখী, ভাগ্যবান্ কি হতভাগ্য, এ পর্য্যন্ত

তাহার কোন মীমাংসা হয় নাই। তবু তাহার বুকের কাছটা খালি হইয়াই আছে। নরেন্দ্র চুপ করিয়াই রহিল।

বাঁড়ুয্যে কহিলেন,—আমি চল্‌লাম বাবা, মাঝে মাঝে দেখা ক'রো। শোন্‌লাম নাকি তুমি কোন্ নৈশ বিদ্যালয়ের ভার নিয়েছ?

নরেন্দ্র কহিল—হাঁ—

বন্দ্যোপাধ্যায় আপনার কর্ম্মস্থানের দিকে চলিয়া গেলেন। নরেন্দ্র আপনার বাসাভিমুখে আসিতে লাগিল. সন্ধ্যার অন্ধকার তখন অনেক আগেই সমস্ত আকাশে ছড়াইয়া গিয়াছিল। এবং নববর্ষার একখণ্ড মেঘ, আকাশের সুদূরতম প্রান্তে থাকিয়া থাকিয়া গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল, রাস্তার গ্যাসের আলোগুলা জ্বলিতেছিল, যেন প্রেতলোকের সারি সারি প্রেতাত্মাদের মত।

নরেন্দ্রের কোন দিকে লক্ষ্য ছিল না, সে শুধু ভাবিতেছিল, রাহুর মত যে পথেই সে চলিয়াছে, সেই পথেই একটা দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। শান্তির সহিত তাহার জন্মাবধি যেন অহি-নকুল সম্বন্ধ। শৈশবেই মা ছাড়িয়া গেলেন, যৌবনে স্ত্রীই জীবনের একমাত্র সুধাময়ী, সে স্ত্রীও তাহাকে আমল দিল না, পিতা ত্যাজ্য পুত্র করিলেন, তার রহিল

কি ? শুধু তন্ত্র আর মন্ত্র ? দেশ জননীও তাহাকে একটু ঠাঁই দিল না ?

তাহার মনে হইল, সে যেন শুষ্কতালু মরুবালুর তপ্ত পথের উপর দিয়াই চলিয়াছে, আর সে মরুতে একটু স্নেহ নাই, করুণাও নাই।

বিশ্বের যে অমৃতধারার সহিত তাহার সমস্ত জীবনকে এক অখণ্ড প্রীতিতে মিলাইয়া চলিতে পারিত, কে তাহার সে অমৃতের উৎসকে লুটিয়া লইল ? ভিখারীরও যে সঞ্চয় থাকে, তাহার যে তাহাও নাই। একবারে সে দেউলিয়া ! প্রাণের কারবার চলিবে কোথা হইতে ? নরেন্দ্রের চক্ষু দিয়া যেন আগুণের ঝলক বহিয়া যাইতে লাগিল। এতদূর কাঙ্গাল হইলে জগতের কোথায় সে দাঁড়াইবে ?

বড় একটা বুভুক্ষা লইয়া নির্ম্মলার রুদ্ধদ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দ্বারে আস্তে আস্তে ধাক্কা দিয়া ডাকিল দেবী—

নির্ম্মলা অনেক দিন এ অঞ্চলে নরেন্দ্রের পদধ্বনি শুনে নাই, আপনার পূজার ক্ষেত্র হইতে উঠিয়া আসিয়া ভিতরে দ্বারের কাছটিতেই দাঁড়াইল, নরেন্দ্র সে কাপড়ের উস্‌খাস্‌ শব্দ শুনিতে পাইল না কহিল—

দ্বার বন্ধই থাক্‌বে কি দেবী ? কিন্তু আজ আমি ভিক্ষুক

হ'য়েই এসেছিলাম। নিজেকে এত ক্ষুদ্র ক'রে আর কারও কাছে কখনও দাঁড় করাই নি। যেমন আজ দাঁড়ালুম, কাঙাল! কাঙাল! আজ আমি পথের কাঙাল!

নির্ম্মলা মনে করিল, বুঝি নরেন্দ্রবাবুর আয়ের শেষ উপায়টুকুও নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সহানুভূতিতে চঞ্চল হইয়া কিছু বলিবে বলিবে মনে করিতেছে; নরেন্দ্র সেটা বুঝিতে পারিয়া বলিয়া উঠিল। অর্থের কাঙাল আমি নই দেবী! ভালবাসার কাঙাল! জগতে কেউ আমায় ভালবাস্‌লো না,

—পিতা-মাতা কেউ না, আজ তাই তোমার কাছে ভালবাসা ভিক্ষা চাইতে এসেছিলাম। একবার মিথ্যা করেও বলো, যে, ভালবাসি, স্বামি-ভাবে না হোক, বন্ধু ভাবেও বলো ভালবাসি, আমার মরু জীবনটাতে একটু অমৃত ছড়িয়ে পড়ুক! আর যে পেরে উঠ্‌ছিনে, নিজের বুকের মধ্যে মরুভূমি পুষে জগতের কোথাও যে কিছু আদায় ক'র্‌তে পার্‌ছিনে আমার স্পর্শে সব যে জ্বলে জ্বলে উঠ্‌ছে।

দুবার আস্তে আস্তে দ্বারে আঘাত করিল, তবু দ্বার খোলা পাইল না; তখন হতাশ হইয়া বলিয়া উঠিল তবে দ্বার বন্ধই থাক দেবী, আমি সমস্ত জীবনখানিকে উৎসর্গ ক'রে তোমার রূপশিখর-তলে ধ'রে ছিলাম, তুমি তাতে উপেক্ষার রক্তটীকা পরিয়ে তাকে ধন্য ক'রে দিলে, কিন্তু

ভরসা আছে, একদিন দ্বার খোলা পাবোই, তখন আমার ভাঙ্গা তরী রাশি রাশি ভালবাসায় ভ'রে উঠবে। আজ তবে বিদায়, কিন্তু তোমাকেও একদিন এ শুষ্ক পূজার ভারে নুয়ে পড়তে হবে। একদিন বুঝবে যে, তুমি নিজের বুকের রক্ত দিয়ে রাক্ষসেরই পূজা ক'রেছ,—তোমার পুষ্পাঞ্জলি দেবতার চরণে না পৌঁছে দাবানলেই ভস্ম হয়ে গেছে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও নির্ম্মলাও আর কিছু শুনিতে পাইল না। বাহিরে তখন পঞ্চভূতের যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে, সোঁ সোঁ বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টির ছাট বারান্দার প্রান্ত ছাপাইয়া তাহার ঘরের দ্বার পর্য্যন্ত ভিজাইয়া যাইতেছিল। নির্ম্মলা বিছানায় শুইতে গেল।—কিন্তু নরেন্দ্রের ব্যাকুল কণ্ঠস্বরটা স্পষ্ট তখনো তাহার কক্ষের মাঝে ধ্বনিত হইতেছিল; শুইতে পারিল না। কক্ষের পর কক্ষ বড়িয়া একটা উদ্বেল অশ্রুতরঙ্গ তাহার ঘরের কোণে যেন গুমরিয়া মরিতে লাগিল!

আর নরেন্দ্রের উপরে একটুও কি তাহার করুণা হয় নাই? হইয়াছিল বৈকি, বিবাহের পর হইতে সেই ত তাহাকে খাইতে দিতেছে, সমস্ত অভাব অভিযোগ মিটাইয়াছে, ভাইরা টাকাই লইয়াছে, একবার খোঁজও নেয়

নাই। সে ইহার কিছুই না করিলেও পারিত! সে যখন তাঁহার স্ত্রীও নয় আত্মীয়াও নয়, তবু নারীর সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহাকে প্রতিদিন শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিতেছে কিসের জন্য ?

নির্ম্মলার বড় আক্ষেপ হইতে লাগিল, কেন সে মরিতে দুয়ারে খিল দিয়া রাখিল ? ঝড় বৃষ্টিতে নরেন্দ্রবাবু ভিজিতে ভিজিতে কোথায় চলিয়া গেলেন, কথাটা যতই ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার কেমন অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল তাহার অন্তরের সমস্ত নারীপ্রকৃতি যেন বিদ্রোহী হইয়া তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। কে যেন তাহাকে পরুষ কণ্ঠে তিরস্কার করিয়া কহিল, রাক্ষসী পবিত্রতা যদি তোর এতই গৌরবের, তবে বিবাহের দিনে বিষ খাইয়া মরিতে পারিস্ নাই কেন ? এ আশ্রয় নষ্ট হইলে সেই বিষই ত শেষে খাইতে হইবে।

নির্ম্মলা তাড়াতাড়ি দুয়ার খুলিয়া ফেলিয়া দেখিল, কই বাহিরে ত কেহ নাই, শুধু অন্ধকার—মরণের অন্ধকারের মত সীমাহীন—ক্ষুব্ধ ঝটিকা সঙ্কুল!—আর নিশীথিনী যেন বন্দিনী রাজকন্যার মত সেই অন্ধকারের নিবিড় কারা-প্রাঙ্গণে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। দ্বার খোলা হইল, তবু আসিলে না গো—না অন্ধকাররাত্রে পথ পাইলে

না? তাহার পর অবশিষ্ট রাত্রিটুকু বিছানার বাহিরে দাঁড়াইয়াই কাটাইয়া দিল!

প্রভাত হইলে শোনা গেল, নরেন্দ্র ঘরে নাই, বর্দ্ধমানে দামোদরের বাঁধভাঙ্গায় কতিপয় সঙ্গিসহ প্লাবন-পীড়িত গ্রামসমূহে সাহায্যের জন্য চলিয়া গিয়াছে। ঝিয়ের কাছে নির্ম্মলার নামে যে চিঠিখানা রাখিয়া গিয়াছিল, সেই খানা নির্ম্মলার হাতে পড়িল!

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

শশী ডাকিল, হিমানি!

হিমানী নতমুখে শশীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

শশী কহিল,—শুনেছ, আর তিন চারদিনের মধ্যেই তোমার মা, রাজশেখর বাবু, রাজশেখর বাবুর ভগ্নী কাশী যাচ্ছেন!

হিমানী কহিল, হাঁ শুনেছি।

শশী কহিল,—মা চলে গেলে তোমার মন কেমন করবে না?

মায়ের কথায় হিমানীর চক্ষু দু'টি ছলছল হইয়া আসিল।

শশী কহিল,—তা রাজশেখর বাবু তোমাকে বিষয়ের অর্দ্ধেক দেব ব'লে শেষকালে লেখাপড়ার সময় সিকি লিখিয়েছেন। এটা তাঁর ভাল হয় নি।

হিমানী খুব নীচুস্বরে কহিল, এই যা লিখিয়েছেন—তাও না লিখ্‌লে আমাদের কিছুই দাবী করবার ছিল না, কারণ কোন সত্বই নাই।

শশী কিছু ক্ষুণ্ণ স্বরে কহিল,—"তা ঠিক হ'লেও তোমায় আনিয়েছিলেন কেন? এদিকে আমিও কাঁচা ছেলেটি নই—চেষ্টা দেখ্‌বো।

হিমানী দীপ্ত হইয়া উঠিল, কহিল—কি দেখ্‌বে?

শশিভূষণের চাহনিটা তাহার নিকট ভাল ঠেকিল না, শশীর চক্ষু দুইটী যেন কি এক ষড়যন্ত্রের কল্পনায় রাঙিয়া উঠিয়াছে।

হিমানী কহিল,—সে বিষয় সম্বন্ধে তুমি কিছুই করিতে পার না!

শশী বুঝিল সে আপনার কথার সংযম রক্ষা করিতে পারে নাই। হিমানীকে ঠাট্টা করিয়া কহিল,—পাগল, কার বিষয় কে লোভ করবে? তবে—

হিমানী কহিল,—তবে কি ?

শশী কহিল,—তবে কিনা নরেন বাবুর সঙ্গেই তোমার বিয়েটা হ'লে ঠিক রাজজোটক হ'ত।

হিমানী মুখ নীচু করিয়া কহিল,—যাও ; বলিয়া অপর দিকে মুখ ফিরাইল, চোখের কোলটি তাহার আপনি ভিজিয়া আসিল ; কিন্তু সে এই ক'দিনের সাধনায় আপনাকে সামলাইয়া লইতে শিখিয়াছে।

শশী হিমানীর মাথায় হাত বুলাইয়া কহিল,—কি যন্ত্রণা। কাঁদবার ইচ্ছাটুকু আছে, কিন্তু সামর্থ্য নাই। আমি তোমার এ সহ্য করবার শক্তিটাকে খুব ধন্যবাদ দিই।

হিমানী আর ঘরের মধ্যে দাঁড়াইল না, দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। আকাশের নক্ষত্রগুলি তাহার দিকে করুণাবিগলিত নেত্রে চাহিয়া রহিল। শশিভূষণও বাহিরে আসিল কিন্তু তাহার পদধ্বনি শোনা মাত্র কে একজন দ্রুত অন্ধকার বারান্দা দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

শশী কহিল, কেও ? নীচের কণ্ঠস্বরে কে আসিয়াছিল তাহা আর বুঝিতে কাহার বাকী রহিল না ; উভয়েই বুঝিল, ক্ষীরোদা আসিয়াছিল।

শশী ডাকিল, বৌঠাকরুণ ? ক্ষীরোদা পুনরায় উঠিয়া আসিল, কহিল,—এই ভাই তোমাদের কি কথাবার্ত্তা হয়

তাই শুন্‌তে এসেছিলাম, ঠাট্টার সম্পর্কের অনেকে অমন আড়ি পাত্‌তে এসে থাকে!

শশী কহিল,—তার জন্যে আমি দুঃখিত হ'চ্ছি না, কিন্তু দুঃখিত হ'চ্ছি এই কারণে বেশ ভাল লোকটির সঙ্গেই আমার বিয়ে দিইয়ে দিলে।

ক্ষীরোদা কহিল,—কেন মন্দই বা কিসে,—রূপে গুণে এমন মেয়ে কয়টাই বা মেলে।

শশী কহিল,—তার কথা হ'চ্ছে না।

ক্ষীরোদা কহিল,—দাঁড়াও, কি কাণ্ডটা হ'য়ে গেল—বোঝ দেখি, এখন যে জটটা পাকিয়ে গেছে আস্তে আস্তে ওকে তা খুল্‌তে দাও এত তাড়াতাড়ি ক'রলে চল্‌বে কেন? কেমন গো হিমানী? এ কথায় হিমানী চঞ্চল হইয়া উঠিল। এবং সে আস্তে আস্তে নীচে চলিয়া গেল।

হিমানীর গমনের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীরোদা হিমানীকে শুনাইয়া কহিল,—আমিও যাই ভাই।

শশী ইসারা করিয়া কহিল,—যাবেই ত; দাঁড়াও কথা আছে।

ক্ষীরোদা ব্যস্ত হইয়া কহিল,—বল ভাই, দাঁড়াবার সময় নাই, মা নীচে দাঁড়িয়ে আছেন। অঞ্চলে লুকায়িত জপের মালাটা একবার ঝাঁকাইয়া লইল।

শশী কহিল,—আমি কি ও মেয়েকে বিবাহ করতাম? শুদ্ধ বিষয়ের লোভে, নইলে যে অন্তরের মধ্যে সর্ব্বদা আর এক জনকে ভাব্‌ছে—

ক্ষীরোদা কহিল,—তা নয়, তবে হাঁ ইচ্ছাটা হ'য়েছিল বৈকি। কিন্তু ঐ নরেন্দ্রবাবুর মত পুরুষ গুলিরই কি আক্কেল, হিমানীর সঙ্গে বিবাহ করবার সুযোগ হলো না যখন তখন তাই বলে কি বিধবাকেই বিবাহ ক'রতে হয়? আর, সে কালামুখীদেরও কি বুকের পাটা!—ছি ছি! একটু কি কারও লজ্জাও হ'লো না।

শশী। "পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ"—লজ্জায় কি আটক থায় বৌঠাকরুণ?

ক্ষীরোদা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল, যেন কথাটার অনেকটা ঝাঁঝ তাহাকেও স্পর্শ করিয়াছিল। সে শশীর-দিকে একটা চকিত কটাক্ষপাত করিয়া কহিল,—অসম্ভব ঠাকুরপো, বিধবার বিবাহ শাস্ত্রে লেখে না।

শশী কহিল,—শাস্ত্রেই লিখেছে, যদি কেউ রাজী হয় তাহ'লে শাস্ত্র প্রমাণের ভার আমার ওপর রইল।

ক্ষীরোদা দুই হাতে আঁচলে মুখ ঢাকিয়া কহিল,—রক্ষা করো ঠাকুরপো। আর বলো না, কেউ শুন্‌লে হয় ত বল্‌বে ক্ষীরোদাও বিয়ে করতে রাজী হ'য়েছে! মাগো সে কি লজ্জা!

শশী কহিল,—কিন্তু পাত্রের অসদ্ভাব হয় না, যদি রোহিণীর মত আমারও কেউ উইলটা বদলে আন্‌তে পারে—

ক্ষীরোদার মুখটা সহসা কেমন অস্বাভাবিকরকম উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ; মুখের কাপড় সরাইয়া কহিল,—এ বিধবাকে কে বিবাহ ক'র্‌বে ঠাকুরপো, যার কিছুই নাই, হাসি নাই, স্বপ্ন নাই, রূপ নাই, যৌবনও নাই।

শশী ক্ষীরোদার হাতের মালাটা টানিয়া দিয়া কহিল,—আছে গো আছে,—জগতে দেবী যদি থাকে, তবে তার ভক্তেরও অভাব নাই। অন্ততঃ আমার নিজের পক্ষ হ'তে এ কথা ব'ল্‌তে পারি—

ক্ষীরোদার তন্দ্রামগ্ন জীবনের উপর দিয়া যেন সহসা কাহার দুটি কোমল চরণের পদধ্বনি বাজিয়া গেল, সে পাঁয়জোর নূপুরের নিক্কণ নাই, আছে জ্যোৎস্নার নিঃশব্দ পদসঞ্চারের মত স্বর্গমর্ত্ত্য ব্যাপিয়া একটা নীরব অভিসার। তাহার হৃদয়টা যেন শতদলে ফুটিয়া উঠিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

প্রত্যুষে বিছানা হইতে উঠিয়াই ক্ষীরোদার প্রাণটা কেমন ছাঁৎ করিয়া উঠিল। রাত্রে যে একটা মধুর স্বপ্নে আবিষ্ট হইয়াছিল, প্রভাতালোকে চাহিয়া দেখিল, তাহার সে স্বপ্ন একটা মরীচিকার মতই অন্তর্ধান করিয়াছে কি স্বপ্ন দেখিয়াছিল তাহা তাহার মনে পড়িল না, তবু মনে হইল যেন অতি মধুর, অতি আকাঙ্ক্ষার একটা কিছু, দেখিয়াছিল। আপনিই তাহার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। আজ সে সংসারের কোন কাজ কর্ম্মেই ভিড়িতে পারিল না। তাহার উপরে একাদশী, খাওয়া দাওয়ারও কোন বালাই নাই! বৈধব্যের যন্ত্রণায় আজ তাহার প্রথম কান্না, জগতের নির্ম্মমতার দিকে চাহিয়া এই তার প্রথম কান্না। এ রকম আপনার দিকে চাহিয়া কাঁদিতে সে অভ্যস্ত কখন হয় নাই। আজ তার মনে হইল সবারই ত সব রহিয়াছে, সেই কেন বঞ্চিতা? তাহারই কেন হাসি নাই, স্বপ্ন নাই, সুখ নাই, সৌভাগ্য নাই। বিধাতাকেই বা দোষী করা যায় কোন হিসাবে। বিধাতা ত তাহাকে পতিহীনা করিয়া সংসারে পাঠান নাই।

মানুষই ত তাহাকে মানুষের অধিকার দিল না। তাহাকে বঞ্চিত করিয়াই রাখিল নহিলে তাহার অন্তরের মধ্যে এই যে মাতৃত্বের সাধ, এই যে পত্নীত্বের গৌরব এও ত মিথ্যা হইতে চাহিতেছে না। অসময়ে বিবাহ না হইলে তাহার ত আজ সবই রহিয়া যাইত! আশ্চর্য্য অদ্ভুত যুক্তি সকল তাহার মাথার মধ্যে আসিতে লাগিল।

যে নাগিনী অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে শুদ্ধ আপনার দীর্ঘশ্বাস লইয়া কুণ্ডলী পাকাইয়াছিল, কোন সাপুড়িয়া আসিয়া, তাহাকে এ উন্মাদমন্ত্র শোনাইয়া গেল। ঘরেও তাহার মন টিকিল না। বাহিরে আসিয়া সে দাঁড়াইল। কিন্তু বাহিরের পৃথিবীর আজ একি বেশ। প্রথম আষাঢ়ের কালো মেঘে আকাশ ছাইয়া গিয়াছে, নদীতীরের বাবলা কুঞ্জ একেবারে নীল। এই অন্ধকার সিক্ত প্রকৃতির উপর দিয়া প্রকৃতি রাণী আজ যেন কোন অভিসারিকার বেশেই চলিয়াছে। আকাশে ঘনঘটা, বাটে বাটে কর্দ্দম, কণ্টক, তবু যাত্রার বিরাম নাই দুঃসহ এ যৌবন ভার!

ক্ষীরোদার অন্তরে বাহিরে, বিদ্যুতের একটা স্ফুরণের মত, যৌবন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।—যে জীবন এত দিন সুপ্ত ছিল তাহা যেন আজিকে এই বর্ষারজনীর ঘন কল-তানে শিরায় শিরায় প্রাণের ও প্রেমের প্রাচুর্য্যতায় ভরিয়া

উঠিতে লাগিল। বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, তাহার মুখে চোখে যেন তাহাই অশ্রু হইয়া টল টল করিতে লাগিল। তাহার অক্ষয় রূপ অনন্ত যৌবন লইয়া সেও অভি-সারিণীর বেশেই পৃথিবীর উপর দিয়া চলিবে, হয় .বাঞ্ছিত লাভ নয় মৃত্যু।

সন্ধ্যাবেলায় তাহার মা একটু মিষ্টি ও একগ্লাস জল লইয়া তাহাকে খাওয়াইতে আসিল। ক্ষীরোদা সন্দেশের রেকাবিটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল,—দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে মরতেই যাকে আদেশ দিয়েছ, তার জন্য এ সব কেন! তার চেয়ে চেষ্টা দেখ সহজে যাতে শেষ হ'য়ে যায়।

মা হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া কহিলেন,—বলিস্ কি ক্ষীরোদা। এক ত বিধবাই হ'য়েছিস্ তাই বলে বাঁচবার মত সুযোগও একটু দেব না। দিনমানটাই না হয় পাঁচ জন দেখ্‌বে, রাত্রে ত কেউ নেই, এখন একটু মুখে দিতে দোষ কি?

ক্ষীরোদা জ্বলিয়া উঠিল, কহিল—মা অনেক ফাঁকি দিয়েছি, সমস্ত জীবনটাই আমার কাছে এক পরম ফাঁকি, তাই ভাবছি ফাঁকি দিতে পারি—বড় ফাঁকিই দেব, এমন ধারা তিলে তিলে ফাঁকি আর সইব না।

কি ক'রবি ভেবেছিস্?

কেন ম'র্‌বো। সেই ত সব চেয়ে বিধবার সহজ উপায়।

মরিস্ না ক্ষীরোদা! ভগবান প্রাণ দিয়েছেন তাকে নষ্ট করবার জন্যে নয়, সে যে মহাপাপ বাঁচাই যে মনুষ্যের ধর্ম্ম!

দেখ মা, আমায় বেশী বকিও না, আমায় এই জন্যই ত বেশী মরবার ঝোঁক যে বাঁচবার কোন উদ্দেশ্যই নাই। লোকের একটা আশাও থাকে, তার স্বামী পুত্র কি সংসার, কিন্তু আমার?—

এ কথার উত্তর আর মা খুঁজিয়া পাইলেন না। আপনিই তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

ক্ষীরোদা তাহার মায়ের হাতটা চাপিয়া কহিল,—দেখ মা, জায়গা জোড়া হ'য়ে বেঁচে থাকাটাই হ'চ্ছে পাপ, তার বাড়া পাপ ত দেখি না, কারও কোন কাজে লাগবার উপায় নাই।

সহসা একটা বজ্রপতনের সঙ্গে দূরে নিকটে একটা মৃত্যুকলরব গর্জ্জিয়া উঠিল। ক্ষীরোদাও তাহার মা বাহিরে আসিয়া শুনিল যেন, লোকে চীৎকার করিয়া বলিতেছে, বান—বান—দামোদর বাঁধ ভাঙ্গিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। ক্ষীরোদার মা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ক্ষীরোদা কহিল,—

ভয় কি মা, জল ছুটে আসলে আমরা সেই জলে গা ভাসিয়ে দেব। ভগবান আজ আমার কথা শুনতে পেয়েছেন।

দেখিতে দেখিতে মুহূর্ত্তের মধ্যে সুপ্ত গ্রাম প্রান্তর মরণের বিভীষিকায় আর্ত্ত হইয়া উঠিল। এ বিপদে কে কাহাকে সাবধান করে তাহার ঠিকানা নাই। বান যেন তালগাছ প্রমাণ হইয়া খেপিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। যে পারিতেছে ঘরের চালের উপর উঠিতেছে, যে পারিতেছে না, স্ত্রী পুত্র কন্যা বক্ষে করিয়া দরিয়াতেই ভাসিয়া যাইতেছে। মৃত্যুর এ কি উন্মত্ত তাণ্ডব লীলা!

ক্ষীরোদা আপনার ঘরের পাশে দাঁড়াইয়া মৃত্যুর এই ভয়াবহ ধ্বংস দেখিতেছিল। জলস্রোত তাহার ঘরের দাওয়া পর্য্যন্ত ছাপাইয়া উঠিল, তবু সে নড়িল না। সে কেবল সুযোগই খুঁজিতেছিল কখন বারিরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিয়া লইয়া যাইবে। জীবনে আর তাহার কিছুমাত্র মমতা ছিল না মা জিনিষপত্র গোছাইতে ব্যস্ত ছিলেন আর ক্ষীরোদাকেও সব সাবধান করিবার জন্য তাগিদ দিতেছিলেন, কিন্তু ক্ষীরোদা উঠিতেও ছিল না। নড়িতেও ছিল না। একটা অফুরণ সমুদ্র পিপাসা তাহার মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল।

ক্ষীরোদার মা একবুক জল ভাঙ্গিয়া পড়শীর ঘোষালদের বাড়ীতে নিজের কতক জিনিষপত্র রাখিয়া আসিলেন। জল যখন ঘরের দাওয়া পর্য্যন্ত গ্রাস করিল তখন ক্ষীরোদা ঘরের চালের উপর মই দিয়া উঠিয়া বসিল মা একটা কাপড়ের বড় পোঁটলা ভাসাইয়া পড়শীর ঘোষালদের দালানে উঠিলেন ক্ষীরোদাকেও তিনি বার বার ডাকিলেন কিন্তু ক্ষীরোদা ঘর আগলাইবার নাম করিয়া আর সেখান হইতে নড়িল না। আজ তাহার মৃত্যুপিপাসা জাগিয়া উঠিয়াছে, জলস্রোত ভৈরব কলরবে গ্রাম প্রান্তর গ্রাস করিতে ছুটিয়াছে, রোদনে হাহাকার (আর্ত্তনাদ) চারিদিক আর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, ইহাই ত সে চায়। এত বড় একটা মহাপ্রলয় নহিলে তাহার মরিয়াও সুখ কোথায়? মৃত্যু ত তাহার শুধু চরম পরিণতিই নয়। মৃত্যু যে তাহার বর। যাহারা তাহার দুঃখে হাসিয়াছে ব্যঙ্গ করিয়াছে কটাক্ষ করিয়াছে, তাহাদের সকলেরই সহিত তাহার একপরিণাম এই মহাপরিণামের প্রলয়ের দোলার উপর নাচিতে নাচিতে রিক্তবেশ রিক্তভূষণ বিধবা মৃত্যু দেবতাকেই বরণ করিবে।

বাজাও বাজাও শঙ্খ হে নটনাথ! তোমার এই তাণ্ডব নৃত্যের পরে একটা কিছু আছেই।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ক্ষীরোদা সারারাত্রি এমনি জাগিয়া একটি ঢেউএর অপেক্ষায় প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল। বর্ষণ যদিও হয় নাই কিন্তু মেঘ ঘোর করিয়াছিল এবং মাথার উপর বিদ্যুৎও চমকিত হইতেছিল।

রাত্রি প্রায় অবসান হইয়া আসিয়াছে এমন সময় ক্ষীরোদা দেখিল ভোরের আবছায়ার ভিতর হইতে একখানি নৌকা ভাসিতে ভাসিতে তাহারই দিকে আসিতেছে।

ক্ষীরোদা নৌকার আরোহীকে চিনিতেও যেন পারিল। তাহার হৃদয়টা কাঁপিয়া উঠিল। সে আপন মনেই বলিল সবাই ঘর ছাড়িয়াছে দেশ ছাড়িয়াছে শশীই কেন ছাড়িল না! তাহার কিছু বলিবার পূর্ব্বেই নৌকাখানা তাহার অতি কাছে ঘরের চালাটার ধারে আসিয়া লাগিল।

ক্ষীরোদা সারারাত্রি বিনিদ্র অবস্থায় ছিল। তাহার মুখ চোখ অস্বাভাবিক রকম শুকাইয়া গিয়াছিল—

শশী কহিল—সারারাত্রি জেগে ব'সে আছো?

ক্ষীরোদা কহিল,—আশ্রয় কোথায়?

শশী কহিল—আশ্রয় আছে, আমার এ ভাঙ্গা নায়ে একজনাকার মত আশ্রয় আছে।

এই মৃত্যু সমুদ্রের বুকের উপর সহসা আশ্রয় আছে,

এই একটা কথায় ক্ষীরোদার মধ্যে যেন প্রাণ নৃত্য করিয়া উঠিল তবে আশ্রয় আছে, একবারেই ভাসিয়া যাইবে না। ক্ষীরোদা একবারেই তরীটাতে উঠিয়া পড়িল।

শশী কহিল—আমিও সব হারিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছি। ভগবান্ কি দিন যে আন্‌লেন।' যে দিকে চাই—অকূল-পাথার। ক্ষীরোদা বলিল—"ভেসে পড়ো একটা সঙ্গীও ত ভগবান জুটিয়ে দিলেন।"

"হুঁা কিন্তু হিমানীকে সঙ্গে নিতে পারলাম না। সে রাজশেখর বাবুর দালানেই র'য়ে গেল। আর কারও কোন সন্ধানই পেলাম না।

ক্ষীরোদা শক্ত করিয়া শশীর হাতটা চাপিয়া ধরিয়া কহিল—শশীবাবু ভাসিয়ে দাও তরী যতক্ষণ ভেসে যাওয়া যায়। ওদিকে পুবের আকাশ ফর্শা হয়ে আস্‌ছে আমাদেরও জীবনের পারে একটা প্রভাত দেখা যাচ্ছে। শশীবাবু নৌকা চালাও।

বাঁ হাত দিয়া নৌকার দাঁড়টাতে নিজেই একটা ধাক্কা দিয়া দিল। ছোট পানসী নৌকা, সামান্য একটু বলপ্রয়োগে দরিয়ার মুখেই পড়িল।

শশীর অনেক দিনের একটা গান মনে আসিতেছিল।

আলো নাই ছায়া নাই কারও কোথাও সাড়া নাই—

দুপারেতে সুপ্তি মগ্ন তরু বন ছায়া
সহসা উঠিল ভাসি কাহার আলোক রাশি
কে দিল জাগায়ে হায় কোথাকার এ কি মায়া
এযে আলো ছায়ার অন্ধকারে—
তরী খানি যায় পারে—
দূরে ভাসে চিকি মিকি কাছে পিছে কেহ নাই।

শশী দাঁড় বাহিতে বাহিতে ঐ গানটাই মিহিগলায় াহিতে লাগিল।

ক্ষীরোদা কহিল,—চুপ করো ভাই, আমায় একবার দখ্‌তে দাও। মৃত্যুর এমন মহিমাময় সমারোহ দেখা এ জীবনে ঘট্‌বে কিনা সন্দেহ। ঐ ঝুপ ঝাপ ঘর বাড়ী 'ড়ে যাচ্ছে গাছে মন্দিরে কোথাও বাকী নাই লোক ঠ্‌ছেও যেমন পড়্‌ছেও তেমনি, ধনী দরিদ্র সবারই জীবন াজ একদরে বিকুচ্ছে, চমৎকার!

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্র কাজের মধ্যে আপনাকে চিনিয়া লইল। যে বিন কিছু পূর্ব্বে রাহুর মত, দুগ্রহের মত বলিয়া াপনাকে অভিসম্পাত করিয়াছিল, আজ এই প্লাবন ও

পীড়নের মধ্যে আপনাকে উৎসর্গ করিয়া বুঝিল, আর জীবন তাহার ভারবহ নহে, এইখানেই সে আসল নরেন্দ্র নাথ। সে যাহা, তাহা এই দুঃখ দারিদ্র্য অভাব দৈন্যে মধ্যেই, এই হাজার মানুষের সুখ দুঃখের সঙ্গেই তাহার এক গতি; কোথায় ভাসিয়া গেল নিজ জীবনের ক্ষুদ্র স্বার্থ, ক্ষু অভিমান!—নরেন্দ্র চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, এ প্লাবনের মধ্যে আমি, এই দুঃখের মধ্যে আমি! মানুষে এই দুঃখের মাঝে ছাড়া আমি আর কোথাও নাই অপরাহ্নের দিকে সে শুনিল, তাহাদের নিজ গ্রামের দিকে একটা হানা পড়িয়া সেখানে একবারে ছয়লাপ হই গিয়াছে। সেখানকার দালান বাড়ী পর্য্যন্ত ডুবিয়া গিয়াছে

নরেন্দ্র সহকর্ম্মিদিগের উপর বর্দ্ধমানের সহরতলী দে বার ভার দিয়া ছোট এক পানসী যোগে কয়েকজন স সহ নিজগ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। তীব্রবেগে দামে দরের জল ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহাদের গ্রামে পৌঁছি বিলম্ব হইল না। কয়েকটা উচ্চ বৃক্ষচূড়া ও গৃহদেবত মন্দিরচূড়া ছাড়া গ্রামের আর চিহ্ন কোথায়? সব ডুবিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে যতদূর দৃষ্টি যায় খেঁ করিয়া দু'চারজন মজ্জমানকে আপনাদের নৌকায় তুলি লইয়া নরেন্দ্র আপনাদের বাড়ীখানার অনুসন্ধান করি

লাগিল—ভাবিল, যদি তাহাদের দ্বিতল অট্টালিকাটী জাগিয়া থাকে তবে যে কয়েকজনকে হাতের কাছে পাইয়াছে তাহাদিগকে বাঁচাইতে পারিবে। অনেকক্ষণ ঘুরিয়া দেখিল তাহাদের অর্দ্ধনিমজ্জিত অট্টালিকা হইতে ক্ষীণ একটু আলোর রেখা আসিতেছে। নরেন্দ্র দ্রুত সেই দিকে নৌকা ফিরাইল। কিন্তু ঘরের কাছে উপস্থিত হইতে এ কি বাধা! কে নৌকা ভিড়াইতে বাধা দিতেছে!

অন্ধকারে ভাল নজর চলিতেছিল না—নরেন্দ্র করুণ কণ্ঠে কহিল, "যেই হও; আমাদের সঙ্গে অনেকগুলি পীড়িত মানব, এই রাত্রি টুকুর মত আশ্রয় দাও।"

পরুষ কণ্ঠে উত্তর হইল, "এক মুহূর্ত্তের জন্যও আশ্রয় নাই। এ দুর্য্যোগে কে কারে আশ্রয় দেয়।"

"ঈশ্বরের এমন বিচারের পরেও এখনও মোহ চক্ষু খোলে নাই?" বলিয়া নরেন্দ্র লাফ দিয়া দালানের বারান্দাটির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল!

একটা বিকট চীৎকার উঠিল, দস্যু! দস্যু! নরেন্দ্র 'সাবধান' বলিয়া বাধাপ্রদানকারীকে একটা ঠেলা দিয়া নৌকা হইতে পীড়িতদের উঠাইতে লাগিল! শীর্ণদেহ বাধা-প্রদানকারী পুনরায় উঠিয়া কহিল, "তুমি কে হে, তোমার কি এটা, বাবাকেলে বাড়ী মনে ক'রেছ?"

নরেন্দ্র গম্ভীরস্বরে কহিল,—আমি তাই মনে ক'রেই এসেছি।

এমন সময় দীপহস্তে এক তরুণী বারান্দার একপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। নরেন্দ্র প্রদীপের অস্পষ্ট আলোকে চাহিয়া দেখিল, দীপহস্তে এ কে! এ যে হিমানী, আর বাধাপ্রদানকারী দাদাঠাকুর রামলোচন চক্রবর্ত্তী মহাশয়! নরেন্দ্র তীব্র দৃষ্টিতে একবার রামলোচনের দিকে চাহিয়া লইল। রামলোচন সন্ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, কি সর্ব্বনাশ! এ প্রলয়ের দিনেও ম্লেচ্ছ সমাগম!

নরেন্দ্র দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া কহিল,—সাবধান চক্রবর্ত্তী, এ বিপদের দিনেও তোমার আসল চেহারাখানিকে বদলাইয়া লইতে পার নি। বেশী উত্তেজনা প্রকাশ কর ত তুমিই এ আশ্রয় হ'তে চ্যুত হবে!

রামলোচন দুইবাহু উর্দ্ধে তুলিয়া ডাকিতে লাগিল, আসুন গো রাজশেখরবাবু আপনার ম্লেচ্ছ পুত্রের একবার জবরদস্তি দেখে যান, আমরা স্ত্রীকন্যা নিয়ে আশ্রয় নিয়েছি, উনি কিনা কতকগুলো অস্পৃশ্য ছোটলোক সংগ্রহ ক'রে,—

নরেন্দ্র রামলোচনের দুই হাত চাপিয়া কহিল,—চুপ। তোদের চাইতেও অস্পৃশ্য এখানে আছে! লজ্জা ক'রচে না,

ভগবান সব ব্যবধান ছিন্ন ক'রে মরণ বাঁধনে এক করেচেন, তবু আভিজাত্য ঘুচছে না! আমি সত্যই বল্‌ছি বাধা দিবার সময় এ নয়! যাদের কাছে পেয়েছি, তাদের বাঁচাতেই হবে আমাদের।—নরেন্দ্রের সঙ্গীরা ইতিমধ্যে স্পিরিট ল্যাম্প জ্বালাইয়া জমাট দুগ্ধের কৌটা হইতে দুগ্ধ তৈয়ার করিয়া ফেলিয়াছিল।

নরেন্দ্র দুগ্ধ লইয়া সকলকে খাওয়াইতে লাগিল, দুগ্ধ খাওয়াইবার পর সঙ্গীদের কহিল,—সঙ্গে আর কাপড় আছে কি?

সঙ্গীরা কহিল,—না।

নরেন্দ্র নিজের উত্তরীয়খানা একজনার অঙ্গে জড়াইয়া দিয়া হিমানীর দিকে চাহিয়া কহিল,—আছে কি? আজ এদের দরকার হ'য়ে উঠেছে।

হিমানীর মনের মধ্যে এতক্ষণ যে একটা সঙ্কোচ, যে একটা বেদনা, অভাবনীয় অনভূতপূর্ব্ব বিস্ময়ের সঙ্গে সৃষ্টি মুহূর্ত্তে ব্রহ্মাণ্ডের আবর্ত্তনের মত আবর্ত্তিত হইতেছিল। নরেন্দ্রের একটা কথায় তাহা কাটিয়া গেল। মনে করিতে পারিল না।—এই নরেন্দ্রনাথই একদিন তাহাকে উপেক্ষা করিয়া তাহার সমস্ত পূজা প্রচেষ্টার উপরে অবজ্ঞার বজ্র-হাসি হাসিয়া হেলায় চলিয়া গিয়াছিল। তখন হিমানীকে

কে যেন সমঝাইয়া দিয়াই বলিল, উপেক্ষাই যে তাহার প্রয়োজন ছিল। সমস্ত বিশ্বসংসার যাহার ভালবাসার ক্ষেত্র; ক্ষুদ্র হিমানীকে তাহার পোষাইবে কেন?—তাহার উপর চক্ষের সম্মুখে এতক্ষণ এই সমস্ত আর্ত্ত প্লাবন-পীড়িত-দের শুশ্রূষাও দেখিয়া লইতেছিল।—তাহার মনে হইল সে যেন দেবতার সম্মুখীন হইয়াছে। সে বিধবাকে বিবাহ করার অর্থটাও এক রকম বুঝিয়া লইল! বুঝিল মানুষের দুঃখ তাহার পক্ষে অসহ্য। হিমানী অন্তরের মধ্যে শতবার নরেন্দ্রকে নমস্কার করিয়া নরেন্দ্রের আদেশ পালনের জন্য ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। এবং আপনাকে সৌভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিল এই কারণে—যে এই নরেন্দ্রনাথ তাহাকে ভগ্নী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

এই শুশ্রূষায় সেও সাহায্য করিতে লাগিয়া গেল। দ্রুত ঘরের মধ্য হইতে কয়েকখানি কাপড় আনিয়া নরেন্দ্রের হাতে দিয়া দিল। নরেন্দ্র সেগুলি যথাযোগ্য পরস্পরকে গুছাইয়া দিয়া সঙ্গীদের আহারের ব্যবস্থার জন্য হিমানীকে অনুরোধ করিল।

হিমানী আসিয়া কহিল,—মাত্র চাল ডাল আছে। রান্না কর্‌বার কাঠ কয়লা কিছুই নাই।

নরেন্দ্র কহিল,—শুদ্ধ চাল হ'লেই চল্‌বে।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্র চাল ডাল ও সঙ্গীদের লইয়া চিলের ছাদের দিকে জায়গা করিয়া দিয়া আসিল। তাহারা স্পিরিট ষ্টোভ জ্বালাইয়া রাঁধিতে লাগিল। তারপর আস্তে আস্তে পিতার ঘরের দিকে আসিয়া পিতার বিছানার কাছটিতেই বসিল।

রাজশেখরবাবু অনেক আগেই শুনিয়াছিলেন যে নরেন্দ্রনাথ আসিয়াছে। তবে দুর্ভাবনা ও প্লাবনের ভারে তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ায় তিনি আদৌ মাথা তুলিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। নরেন্দ্র পিতার পায়ে হাত বুলাইয়া ডাকিল—বাবা!

রাজশেখরবাবু মুখের ঢাকা খুলিয়া পুত্রের দিকে একবার চাহিয়া লইলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া দাদাঠাকুর রামলোচনের নেত্রযুগল ভ্রুকুটিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অনুচ্চস্বরে জনান্তিকে কহিলেন,—বাবুর এখন অসুখ,না ডাকলেই ভাল হ'ত না কি?

নরেন্দ্র রামলোচনের দিকে চাহিয়া কহিল,—আপনার তাতে কি স্বার্থসিদ্ধি হবার ব্যাঘাত হ'চ্চে?

রামলোচন মনে মনে কহিল, কি আপদ। এতরাত্রে এ গ্রহ জুটলো কোথা হ'তে? তবু একটা কথা না কহিয়া থাকিতে পারিল না, কহিল,—দেখ নরেন্দ্রবাবু, তুমি নিতান্ত

ছেলেমানুষ, নিজের হিতাহিত বোধ কোন কালেই ত নাই। এমন অবস্থায় আমরা রাজশেখরবাবুর হিতাকাঙ্ক্ষী বলেই—

এতদূর হিতাকাঙ্ক্ষী কি আর আছে? সস্তায় স্বর্গের লোভ দেখিয়ে বাবুদের মাথার উপর চ'ড়ে ব'সে ধরার আর সবাইকে সরা জ্ঞান করা খুব বুদ্ধিমানের কার্য্য সন্দেহ নাই; কিন্তু আর কতদিন চল্‌বে ঠাকুর, মানুষকে ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারবেন হয় ত, কিন্তু নিজেদের বিবেকের কাছে—

রামলোচন নিজ শিশুপুত্রের একটা হাত ধরিয়া কহিতে লাগিলেন,—চল্‌লাম রাজশেখরবাবু, আপনার চিরকালকার হিতাকাঙ্ক্ষী পুরোহিত আমরা—এ দুঃসময় প'ড়েছে ব'লেই আপনার দুয়ারে ছুটে এসেছিলাম, কিন্তু আপনার ম্লেচ্ছ পুত্র, কতকগুলো ম্লেচ্ছ জুটিয়ে নিয়ে এসে—আপনি ত দেখ্‌বেন না, আমাদেরই আমাদের পথ বেছে নিতে হ'লো। ওঠ গিন্নি, আর নয়! অনেক সয়েছি; কিন্তু রাত দুপুরে ব্রাহ্মণের প্রতি এ অত্যাচার—

রাজশেখরবাবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন, কহিলেন, "দাদাঠাকুর করেন কি? একেই ত আমার এই অবস্থা, আপনি আবার যাবেন কোথা," বলিয়া রামলোচনকে বসাইলেন।

রামলোচন কহিলেন,—আচ্ছা এরাই ত সব র'য়েছে এরাই বলুক, ন্যায়তঃ কার দোষ? নরেন্দ্র খানিক রামলোচনের দিকে তীব্রদৃষ্টিতে চাহিয়া .তারপর পিতার দিকে ফিরিয়া কহিল,—বাবা, ন্যায়তঃ অন্যায়তঃ আমারই দোষ। দোষ নইলে যাদের পরামর্শে আমায় ত্যাজ্যপুত্র ক'রেছেন, তাদেরি মাঝখানে আবার আপনার সমক্ষে আস্‌ব কেন? কিন্তু স্বেচ্ছায় আসিনি। এই সমস্ত নিমজ্জিত পীড়িতদের নিয়েই আস্‌তে হ'য়েছে; কারণ ভগবান আজ আর্ত্তের বেশে, পীড়িতের বেশে, আমাদের সেবা চেয়েছেন, আমরা ত তাঁর ডাক ছুড়ে ফেল্‌তে পারিনি, যেমন আর সকলে ছুড়ে ফেল্‌তে পারেন; তবু ভিক্ষুক হ'য়েও আসিনি যে, আপনার কাছে কাঁদাকাটি ক'রে বা আর কিছু ক'রে নিয়ে যাবো! মাতৃমন্ত্র হ'তে কেমন একটা উন্মাদ মন্ত্র আমার কানে গিয়েছিল, আমার দেবতা বিশ্বভুবনে—তাই ডোর ছিঁড়তে পারিনি বাবা! .যেখানেই দেখেছি মানুষের চোখের জল, সেখানেই ছুটে গিয়ে ·নিজের বুক এগিয়ে দিয়েছি। তাতে পেয়েছিও যেমন আবার হারিয়েছিও বিস্তর;—হারিয়েছি এই আপনাকে পিসিমাকে, তবু মনে হয় পেয়েছি যা, তা হারাণোর চাইতে ঢের বেশী।—

রাজশেখর ছল-ছল নেত্রে পুত্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কোন কথা তাঁহার মুখ দিয়া জোগাইতে ছিল না। তাঁহার অন্তর পুত্রের জন্য ব্যাকুল হইলেও ভবিষ্যতে দাদাঠাকুরদের মত অকর্ম্মণ্য সঙ্গিগুলার বিকশিত দন্ত-পাতির বিকট হাস্যটা তাঁহার বেদনাতুর পিতৃ-হৃদয়কে থামাইয়া রাখিতেছিল। কারণ পুত্র যে আর সমাজের নয়। সে যে বিধবা-বিবাহকারী।

নরেন্দ্র কহিল,—যদি ম্লেচ্ছ ব'লে কি বিধবাবিবাহকারী ব'লে আপনাদের অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয় বলুন, আমি ফিরেই যাচ্ছি, কারণ জগতে আমার আশ্রয়ের অভাব নাই, প্রলয়ের মুখে যে নৌকা ভাসিয়ে দিয়েছে তার আবার ভাবনা কোথায়! তবে যাদের এনেছি, তাদের ঠেল্‌তে পার্‌বেন না। তারাও মানুষ, মানুষকে ঠেল্‌লে মহামানুষ তিনি সইবেন না, আবার নিয়ে আস্‌বেন বন্যা প্লাবন, তখন আবার ভুগ্‌তে হবে। সকল মানুষই যে একগোত্রের বাবা!

দাদাঠাকুর রাজশেখরবাবুর দিকে চাহিয়া কহিল,—রাজশেখরবাবু আপনার এ সমস্ত অসম্বন্ধ প্রলাপ শোনা ভাল হ'চ্চে না। পবিত্র হিন্দু আপনি আপনার ধর্ম্মে আঘাত লাগ্‌বে, এইজন্য শাস্ত্র ব'লেছেন—ম্লেচ্ছস্পর্শে অথবা—

রাজশেখরবাবু ইঙ্গিতে দাদাঠাকুরকে থামিতে বলিয়া কহিলেন,—থাকুক না সব এই রাত্রির মত, কোথায় যাবে।—

নরেন্দ্র কহিল,—কাজ নাই বাবা। কি জানি যদি তাঁর বহুদিনের এত সাধের আয়োজনটা বিফল হ'য়ে যায়, অনেক জপ তপে এ অবসরটি ঘটে গেছে। বলিয়া উঠিয়া পড়িল। উঠিয়া রামলোচনের দিকে একটা কটাক্ষ করিয়া কহিল,—ধন্য যাদুকর, এই সহজ পিতৃস্নেহটার মুখেও পাষাণ চাপিয়ে তাঁকে পঙ্গু ক'রে দিয়ে ব'সে আছ।

বিংশ পরিচ্ছেদ

অনেক রাত্রে রাজশেখরবাবু ডাকিলেন, হিমানী!

হিমানী রাজশেখরবাবুর শিয়রেই বসিয়াছিল, হিমানী কহিল,—বাবা।

রাজশেখর কহিলেন,—তা হ'লে নরেন চ'লেই গেল আর আসেনি।

হিমানী কহিল,—একবার এসে বাহির হ'তে পিসিমার, আর মার খবর জিজ্ঞাসা ক'রে গেছেন।

"তাতে তোমারা কি উত্তর দিয়েছ ?"

"কাকাঠাকুর ব'লে দিয়েছেন, তাঁরা সব কাশীতে—"

"তাতে সে আবার চ'লে গেল ?"

"হাঁ।"

অনেকক্ষণ চুপ চাপের পর রাজশেখর কহিলেন,—আমার সে উইলের বাক্সটি কোথায় হিমানী ?

হিমানী কহিল,—সেটা আমি যত্ন ক'রে রেখে দিয়েছি বাবা ! দরকার আছে কি ?

রাজশেখর কহিলেন—না, বোধ হয় একবার দরকার হ'তে পারে, যাক্। সিকি বিষয় আর গহনাপত্র তোমাকেই দিয়ে গেলাম।

হিমানী কহিল—বাবা সে বিষয় বিক্রী, দানপত্র করবার সর্ত্ত আমার থাক্‌বে ত ?

রাজশেখর কহিলেন,—তা থাক্‌বে বৈ কি মা।

হিমানী রাজশেখর বাবুর পায়ে হাত বুলাইয়া ঘুম পাড়াইতে লাগিল। কিন্তু ঘুম কি তাঁহার চক্ষে আছে ? মৃত্যু যে ভৈরব নৃত্যে তাঁহার পদ্ম নিম্নে গর্জ্জন করিয়া যাইতেছে। এমন একগাছা কাছি নাই যাহাতে তাঁহার অসামাল নৌকাখানা একটু কিনারা পাইতে পারে। ডাকিলেন,—দাদাঠাকুর !

দাদাঠাকুর তখন গৃহের পর গৃহ ঘুরিয়া তাঁহার সংসারটিকে কোথাও একটু নিরাপদ স্থানে রাখিবার সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। কেবলি তিনি পাকা মজবুত ঘর দেখিয়া বেড়াইতেছিলেন অবশেষে রাজশেখর বাবুর পাশের ঘরেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন, গৃহিণীকে কহিলেন—সব হারাও ক্ষতি নাই কিন্তু এই বাক্সটি হারাইও না। চক্রবর্ত্তী গৃহিণী, বুকের মধ্যে বাক্সটিকে লুকাইয়া রাখিলেন।

· রাজশেখর আবার ডাকিলেন, দাদাঠাকুর!

দাদাঠাকুর তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া কহিল,—এখন কেমন র'য়েছেন রাজশেখরবাবু? বেশ স্বচ্ছন্দে র'য়েছেন ত? তা থাক্‌বেনই বা কি ক'রে, এ রাত্রিতেও জলবৃদ্ধির বিরাম নাই। নারায়ণ যে এবার কি ক'র্‌বেন? তাতে ঘরে এত লোক।

রাজশেখর। লোকগুলিকে ত মন্দ ঠেক্‌ছে না। যদি এ বাড়ী ভেঙ্গে পড়ে তবে সবাইকার যে গতি আমারও সেই গতি!—একলা আমি সংসারে কতখানি? থাক্ সে সব কথার জন্য আপনাকে ডাকিনি। হঠাৎ একটা কথা মনে প'ড়্‌লো তাই ডাকলাম; ব'লছিলাম, কি মুক্তি ত ভগবান নিজেই নানা আকারে চক্ষের সম্মুখে ধ'রে

রেখেছেন, একটি ঢেউয়ের অপেক্ষা মাত্র। ব'ল্‌তে পারেন মুক্তির পরে কোথায় দাঁড়াবো—

দাদাঠাকুর। কেন, স্বর্গে—আপনার জন্য ত অক্ষয় স্বর্গ বন্দোবস্ত হ'য়েই আছে।

"কিসে বুঝ্‌লেন?"

"কিসে বুঝ্‌বো না? এই রকম ব্রাহ্মণকে দান ধ্যান কটা লোক ক'রেছে—কলিকালে ত আপনি দাতা কর্ণ, নিজের বিষয় সম্পত্তি এমন ভাবে ব্রাহ্মণ সজ্জনের নামে উইল ক'রে দেওয়া,—ভেবেছেন তার একটা পুরস্কার নাই? স্বয়ং স্বর্গের রাজাকে আপনার জন্য সিংহাসন ছেড়ে দিতে হবে।"

"সিংহাসন পাই না পাই তার জন্য দুঃখ নাই, কারণ জমিদারীর সুখে আর বাঞ্ছা নাই, তবে ধর্ম্মের ধার কি ধেরেছি সেইটুকু আপনাকে ব'ল্‌তে চাই। বলি শুনুন, নিজের ঐশ্বর্য্য নিয়ে কেবল নিজেকেই ফাঁকি দিলাম। ভগবান যা চেয়েছেন তার মধ্যে মোটেই নামি নাই। তাই পূজা শুষ্ক হ'য়ে গেছে, তৃপ্তি পাই নি, তিনি যে দীন-বেশে, দুঃখীর বেশে পথে ফির্‌ছিলেন একথা আমায় কেউ বলেনি।"

"রাজশেখর বাবু, ভুল, মহা ভুল, দুঃখীর আঁস্তাকুড়েই,

যদি ভগবান থাকেন তবে ব্রাহ্মণের মন্দির জানবেন শূন্য—অথচ হাজার শালগ্রামের নিত্য পূজা সেথানে হ'য়ে থাকে।—"

"সেই জন্যই ত ব'লছি, নিজেকে আর ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারছি না। পাষাণের ঠাকুরের চাইতে সত্যিকার ঠাকুরের যুক্তি গুলি চক্ষুর সম্মুখে কেবলি প্রবল হ'য়ে উঠ্‌ছে।„

"রাজশেখরবাবু, আপনার স্বর্গের সমস্ত রাস্তাই প্রস্তুত, ইচ্ছা ক'রে সে স্বর্গ হারাবেন না। আপনি ভেবে দেখুন, কলিতে শাস্ত্র আর ব্রাহ্মণই সত্য।"

রাজশেখর কহিলেন,—সত্য হোক, মিথ্যা হোক তা নিয়ে আমার কিছু যাবে আস্‌বে না দাদাঠাকুর, কিন্তু আমি উইল বদলাবো। ঐ সঙ্গে আপনার ব্রহ্মোত্তরটাতেও—

দাদাঠাকুর চক্ষু কপালে তুলিয়া কহিলেন—বলেন কি? এ বৃদ্ধ বয়সে আপনার মতি বিপর্য্যয় হবে সে ত স্বপ্নেও মনে করি নাই। মাথায় কি হিমসাগরের ব্যবস্থা ক'র্‌বো?

রাজেশেখর কহিলেন,—ততদূরের আর প্রয়োজন নাই, কিন্তু আপনাদের এইবার হ'তে সাবধান হ'তে হবে!

দাদাঠাকুর কহিলেন,—কলি, কলি, ঘোর কলি!

নইলে পুত্রের কথায় পিতা কখনো বিচলিত হয়?—হিমানী রাজশেখরকে পাখার বাতাস দিতে লাগিল।—

একবিংশ পরিচ্ছেদ

বন্যার জল যত সরিয়া যাইতে লাগিল ততই পলি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রাণের মধ্যেও যেন একটা চর পড়িতে লাগিল। তাহাদের সব মলিনতা ধৌত হইয়া তাহাতে একটা নব জীবনের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

নরেন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া গেল, যাহারা কেবল আপনার আপনার লইয়াই মত্ত ছিল তাহাদের মধ্যে এতটা সাত্বিকতা কি করিয়া জাগ্রত হইল—যাহার বলে মানুষ মানুষের পূজার জন্য অকাতরে আপনার সঞ্চিত গোপন পুঁজির দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে পারিল? ক্ষুদ্র হইলেও নরেন্দ্রনাথ তাহা মানুষের কাজেই লাগাইতে লাগিল। এই বিরাট প্রাণ পুরুষের প্রাণ স্পন্দনে রাজশেখরবাবুও বাদ গেলেন না, তিনিও প্রতিদিন তাহাদের কেন্দ্র মধ্যে চাউল শস্য পাঠাইতে লাগিলেন, তবে গোলায় শস্য চাউল ডাউল

ভিজিয়া গিয়াছিল, যাহা ছিল তাহাই পাঠাইয়া দরিদ্র নারায়ণের সেবা লইতে লাগিলেন।

নরেন্দ্র পিতার এই মতি পরিবর্ত্তনে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আশ্চর্য্য হইয়া গেল। পাষাণের ঠাকুর ছাড়া যাঁহার অন্য অবলম্বন ছিল না এবং পাষাণের সাধনাতেই যিনি তাঁহার জীবনের সার ভাগ আহুতি দিয়া আসিয়াছিলেন, তিনি এই সায়াহ্নে এ কোথায় পূজার অর্ঘ্য পাঠাইতে লাগিলেন! দাদাঠাকুর কি করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন?

রমাকান্ত আসিয়া কহিল,—বড় একটা ভাবের মুখে ছোট ভাবগুলোকে আত্মবিসর্জ্জন ক'র্‌তেই হয়—যতই তার স্বাতন্ত্র্য থাক।

নরেন্দ্র কহিল,—তা অস্বীকার কর্‌বার উপায় নাই। কবির কাছ হ'তে যে সুরের আমদানী ক'রেছিলে, সে সুরের আগুন যে সর্ব্বত্র ছড়িয়ে গেল!

রমাকান্ত কহিল,—আমিও তাই এখন আশ্চর্য্য হ'চ্ছি, এখন আসল কথাটা তোমার কাছে বলাও দায় হ'য়ে উঠ্‌ছে। ভাব্‌ছি কি ক'রে ব'লবো।

নরেন্দ্র কহিল—ব'লেই ফেল না। আর সঙ্কোচ করবার কোনই কারণ ত নাই।

রমাকান্ত। তবে শোন, শ্রীমতী নির্ম্মলা তোমার কাছে একটা অনুমতি চেয়েছেন, ব'লেছেন, যদি তুমি তাকে তোমার সকল কাজে সাহায্য ক'র্‌তে অবসর দাও তবেই সে ধন্য হয়, নইলে কাশীই সে চ'লে যাবে।

নরেন্দ্র। এ যাওয়া ত তার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। আমি একদিন তাই চেয়েছিলাম।

রমাকান্ত। তখন তার বালিকা বুদ্ধি কাটে নি—

নরেন্দ্র। এখনও কেটেছে ব'লে ত বিশ্বাস নাই, এবং কখনও কাটিবে কিনা তারও আবার সন্দেহ আছে, যে হেতু আমায় ব'লেছিল—

রমাকান্ত। কি ব'লেছিল?

নরেন্দ্র। ব'লেছিল তার বিবাহে এক ষড়যন্ত্র আছে।

রমাকান্ত। আছেই ত। তার পূর্ব্ব স্বামী মরবার সময় উইল ক'রে যায়, যদি নির্ম্মলা পুনরায় বিবাহ করে তবেই সে তার স্বামীর সমস্ত সম্পত্তিতে স্বত্ববতী হবে, নইলে কিছুতেই তার দাবি থাকবে না, সেই জন্যই আমরা তার বিবাহে এত আয়োজন ক'রেছিলাম, এবং এখন সে আবার যে স্ত্রী সেই স্ত্রীই হ'য়েছেন।—

নরেন্দ্র। খুব বড় এ ঘটনা, কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত একদিনও তার রহস্য ভেদ ক'র্‌তে পারি নাই।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

রমাকান্ত। এখন রহস্যভেদ হ'য়েছে ত? নাও, স্ত্রী নাও, স্ত্রীর সম্পত্তি নাও, এবং সে সম্পত্তির সদ্ব্যবহার করো!

নরেন্দ্র। আজ যে চারিদিক হ'তেই নাও নাও একটা রব উঠেছে, বাবাও পুত্রকে সম্পত্তি ফিরিয়ে নিতে ডেকেছিলেন, কিন্তু আমি সম্পত্তির আয়ের একটা সদ্ব্যয়ের যুক্তি বাবার মনে লাগিয়ে দিয়েছি, ব'লেছি, দেশে আপামর সাধারণ সকলকার জন্যই একটা অবৈতনিক বিদ্যালয় খুলে দিন, আর বন্যার প্রতিকারের জন্য বাঁধ বাঁধিয়ে দিন, পয়সার সার্থক হবে। তিনিও তাতে রাজী হ'য়েছেন এবং হিমানীও—যে হিমানীর কথা তোমায় একবার ব'লে-ছিলাম, সেই হিমানীও আমার পিতৃপ্রদত্ত সম্পত্তিটুকু আমাকে ফেরৎ দিতে চেয়েছে, কিন্তু আমি নেব না ব'লে জবাব দিয়ে দিয়েছি। আবার এখুনি লোক আস্‌বে।

রমাকান্ত আশ্চর্য্য হইয়া নরেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—নরেন্দ্র, তুমি যে আমাকেও ছাপিয়ে উঠেছ। একদিন ভাব্‌তাম, বুঝি আমি মানুষকে যাদুমন্ত্রে মুগ্ধ ক'র্‌তে পারি, কিন্তু এখন দেখছি তুমিও কম যাদুকর নও। আমি জলা দেশে খাল কেটেছি, আর তুমি মরুভূমিতে জাহাজ চালিয়েছ, জিত তোমারই নরেন্দ্রনাথ!

"দেখ আর একটা কথা তোমায় বলবার আছে,"

রমাকান্ত কহিল,—কি।

নরেন্দ্র। নির্ম্মলার সঙ্গে ঠিক আমার স্ত্রীর মতই মিলন নাই হ'লো সেও সেবাব্রত ধারিণী থাকুক আমিও ব্রতধারী থাকি আমাদের মাঝখানে একটা সমুদ্র প্রতিধ্বনিত হ'তে থাকুক। ক্ষুধাতৃষ্ণা কি রক্তমাংসের সম্বন্ধের অনেক ঊর্দ্ধে!—

এমন সময় নরেন্দ্রনাথের পুরাতন ভৃত্য রামনারায়ণ আসিয়া উভয়কে নমস্কার করিল। নরেন্দ্র কহিল—খবর কি?

রামনারায়ণ কহিল,—আবার হিমানী দিদি আপনাকে ডেকেছেন। ব'লেছেন সম্পত্তির জন্য না হোক, ভগ্নী নিমন্ত্রণ ক'রলে সে নিমন্ত্রণটাও রক্ষা ক'র্‌তে আস্‌তে হয়।

রমাকান্ত কহিল,—এবার আর নরেন্দ্রনাথের ফাঁকি দেবার উপায় থাক্‌বে না। রামনারায়ণকে কহিল,—তুমি বলো শীঘ্রই নরেন্দ্রনাথ নিশ্চয় তাঁর সঙ্গে দেখা ক'র্‌বেন। আমার কথা ঠেল্‌তে পার্‌বে না।

রামনারায়ণ "যে আজ্ঞা" বলিয়া চলিয়া গেল। নরেন্দ্রনাথ কহিল,—দেখ আর একটা কারণের জন্য তার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে পারি না।

রমাকান্ত কহিল, কি।

নরেন্দ্র। তোমায় বলিনি যে তার সঙ্গে আমার লোকতঃ না হোক এক রকম বিবাহ হ'য়েছিল এমত অবস্থায় এখন যে তার স্বামী, যার সংসার নিয়ে আছে, তার মাঝখানে একটা দুষ্ট গ্রহের মত যেতেই আমার কেমন বাধবাধ ঠেক্‌ছে।

রমাকান্ত। এইটুকু সম্পূর্ণ নিঃশেষ ক'রে ভোলবার জন্যই যে তোমার যাওয়ার দরকার নরেন্দ্রনাথ!

নরেন্দ্র। আমার মনে হয়, সত্যই বাল্যপ্রণয়ে অভিশাপ আছে, এই জন্যই প্রতাপ, শৈবলিনীর সহিত যাতে আর দেখা না হয়, তার জন্য গিরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে নিজের প্রাণ বলি দিয়েছিলেন।

রমাকান্ত। এ কালের প্রতাপরাও তেমনি মরাটাকে নির্ভয়ে অভিবাদন করে; এবং যা কিছু আশঙ্কা, উদ্বেগ ও বেদনা তা নিজের বুকের পর দিয়েই বাইয়ে ন্যোয়।

নরেন্দ্র। তবে আমি যাবো?

রমাকান্ত। নিশ্চয়ই—

নরেন্দ্র। সেদিন আর একবার দেখা হ'য়েছিল। কিন্তু তখন আমরা সবাই মৃত্যুর কিনারায় দাঁড়িয়ে, সেই জন্য সেও কোন কথাটি ব'লতে পারেনি, আমিও পারিনি।

সেইজন্য তখন আমার কোন সঙ্কোচও আসে নি। কিন্তু আজ, হাজার সঙ্কোচ এসে আমায় জড়িয়ে ধ'রছে এবং অতীতের সমস্ত কাহিনী চিত্রপটের মত আমার চক্ষের সম্মুখে বিচিত্র হ'য়ে উঠেছে।

রমাকান্ত। একটা মন্ত্র না হয় জপ ক'রবে!

নরেন্দ্র উল্লসিত হইয়া কহিল,—শিখিয়ে দাও দাদা! কাজের মাঝে প'ড়ে অনেক মন্ত্রই ভুলে গেচি।

রমাকান্ত কহিল,—সে ভার আমার উপর রইল; কিন্তু দেখ, আর একটা কাজ ক'র্‌তে হবে। তোমার স্ত্রী নির্ম্মলাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে যাবে, বাজে কথা কইবার ভার তাঁর উপরেই থাক্‌বে। তুমি তা হ'লে আসল কথা কটা ক'য়েই খালাস পেয়ে যাবে।

নরেন্দ্র। তাই হ'বে, বলিয়া ঈষদ্ধাস্যের সহিত রমাকান্তকে অভিবাদন করিল।

রমাকান্ত রবীন্দ্রনাথের সেই গানটি গাহিতে লাগিল।

"সাগর গিরি করব রে জয়
যাব তাদের লঙ্ঘি,
একলা পথে করিনে ভয়
সঙ্গে ফেরেন সঙ্গী।

*　　*　　*　　*　　*

মৃত্যু সাগর মথন করে
অমৃত রস আনব হ'রে
　　ওরা জীবন আঁকড়ে ধরে
　　　　মরণ সাধন সাধবে
　　　　কাঁদবে ওরা কাঁদবে ।"

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

বন্যা শেষ হইবার প্রায় দশদিন পরে শশিভূষণ ও ক্ষীরোদা গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্লাবনের পরও গ্রামে যাহারা টিকিয়াছিল, তাহারা কহিল, এতদিন কোথায় গিয়াছিলে তোমরা ? শশী কহিল, ক্ষীরোদা বউঠাকুরাণীর মাসির বাড়ীর দিকেই গিয়ে প'ড়েছিলাম। স্রোতে আমাদের নৌকা সামলাতে পারিনি ব'লে অনেকখানি কষ্ট ভোগ ক'রতে হ'য়েছে। লোকে কিন্তু ব্যাপারটাকে অন্য রূপেই ঘুরাইয়া বর্ণনা করিল, শশিভূষণ সে কথা কানে আনিল না। ক্ষীরোদাও গ্রাহ্য করিল না, আজ যেন কতকটা নূতন মানুষ হইয়াই সে ঘরে ফিরিয়াছে। ঘরে তাহার মা মরিয়া

পচিয়াছিল ক্ষীরোদা খবর পাইয়াও কেন আইসে নাই, তাহার জন্য অনেকে তাহাকে ধিক্ ধিক্ করিল।

ক্ষীরোদা কাঁদিয়া কহিল,—খবর সে পায় নাই। পড়সী-দের ক্ষীরোদার আচরণ বুঝিতে আদৌ বিলম্ব হইল না; তাহারা বুঝিল, অভাগিনী প্রলোভনে পড়িয়া আপনার সতীত্বের অতুল গৌরব হারাইয়াছে। তবে যাহাদের একান্ত ক্ষীরোদার উপর বিশ্বাস ছিল তাহারা মাসীর বাড়ীতে সংবাদ পাঠাইল। ক্ষীরোদা প্রমাদ গণিল।

সে শশীর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া কহিল,—তুমি যা হয় এর একটা বিহিত কর, আমরা আমাদের মাসীর বাড়ীতে গিয়াছিলাম কিনা লোকে যে তার প্রমাণ চাইছে, শীঘ্রই যে সত্য প্রকাশ হ'য়ে যাবে।

শশী কহিল,—চুপ ক'রে থাক। সত্য যখন সত্যের দাবি ক'রছে, তখন মিথ্যা দিয়ে আর কতদিন ঠেকিয়ে রাখ্‌বে।

শশীরও তখন বেশী কথা কহিবার অবসর ছিল না। নিজের স্ত্রীর ব্যবহারের কথাটা খুব গাঢ়ভাবেই তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। এমন কলঙ্কিনী স্ত্রী সে যে কেন গ্রহণ করিয়াছে, তাহার জন্য তাহার মা অনেক-খানি অনুতাপ দিয়া গঞ্জনা দিলেন এবং আর শুনাইলেন, রাজশেখর বাবু যে সম্পত্তি হিমানীর নামে দানপত্র করিয়া-

ছিলেন, হিমানী সেই সম্পত্তি পুনরায় রাজশেখরের পুত্রকে ফিরাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিল। যেই মাঝখানে তিনি এবং কজন লোক পড়িয়াছিল সেই রক্ষা, নহিলে এতদিন সে সম্পত্তি কবে হাত ছাড়া হইয়া যাইত। শশী কহিল,—এই দশদিনের মধ্যে এমন ব্যাপার হ'য়ে গেছে ? সে গর্জ্জিয়া স্ত্রীর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল,—এরকম দুর্ব্বুদ্ধি যে কোন মেয়ে মানুষের হ'তে পারে তা কল্পনাও ক'রতে পারা যায় না। নিজের শুভাশুভের প্রতি সাঁওতাল কন্যারও দৃষ্টি থাকে।

হিমানী অবনত মস্তকে কহিল,—সে সম্পত্তিতেও ত আমার ঠিক দাবি নাই। রাজশেখরবাবু অনুগ্রহ ক'রে তা আমায় দান ক'রেছিলেন যদি খাওয়া পরার কষ্ট হয় কি স্বামী মূর্খ হয় এই ভেঁবে।

শশী কহিল—এরি মধ্যে কি তোমার সে সন্দেহ কেটে গেছে যে তুমি ভাগ্যবানের হাতেই প'ড়েছ।

হিমানী। হাঁ। সেই জন্যই ভাবছিলাম কেন ধেয়ো হ'য়ে থাকবো, তার চাইতে যার সম্পত্তি তারই হাতে যাউক।

শশী। নিতান্ত স্ত্রীবুদ্ধি কিনা, হেলায় একটা লাভের সম্পত্তি কেউ পেয়েও বিসর্জ্জন দিতে পারে। হিমানী এ

কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না। পরের সম্পত্তিতে যে মানুষের এতটা লোভ থাকিতে পারে, তাহা এই সে প্রথম বুঝিল। দিন দিনই সংসারের নূতন নূতন তত্ত্ব তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল সেই জন্য সে আশ্চর্য্য হইল না।

শশী কহিল,—এর পর হ'তে সাবধান হ'য়ো হিমানী; জেনো সম্পত্তি তোমার হ'লেও তা নিয়ে যা খুসি কর্‌বার কোন অধিকার তোমার নাই। তোমাকে তোমার স্বামীর আদেশ মেনে চ'ল্‌তে হবে। এই কথায় হিমানীর অভিমান-গর্ব্বিত নারীত্বটাকে কে যেন আঘাত করিল। হিমানী আর থাকিতে পারিল না, তাহার উপর রাজশেখরবাবুর উইলের সর্ত্তটা তাহার বেশ মনে জাগিতেছিল, কহিল,—ঠিক যদি আদেশ না মেনে চলি?

শশী কহিল,—না চলো, স্রেফ বিষয়টুকুই নিয়েই থাক্‌তে হবে তোমায়! আর কাউকে পাবে না।

হিমানী। তবে বিষয়টুকুর জন্যই স্ত্রীর পরে স্বামীর মমতা!

শশী। কতকটা তাই বৈকি! চোখের সম্মুখে দেখা যায় যে মেয়ের বাপ জামাইকে যত বেশী টাকা জোগাতে পারে সেই মেয়ে জামাইয়ের কাছ হ'তে তত বেশী ভালবাসা পায়।

হিমানী একথা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—খুব ছেলে-বেলায় মনে আছে, বাবা ব'লতেন, টাকা কড়ি থাক্ না থাক্, লেখাপড়া জানা জামাইয়ের হাতে মেয়ে দেবো। সেখানে মেয়ের আর যাই কষ্ট হোক ভালবাসার কষ্ট পোয়াতে হবে না। কারণ যারা শিক্ষিত তারা হৃদয়ের খবর বোঝে।

শশী হো হো করিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল,—হৃদয়, হৃদয়! হারে পাগল, পয়সা নইলে হৃদয় জাগে কোথা হ'তে! মুখে চোখে তাহার একটা দারুণ পিপাসা ফুটিয়া উঠিল। হিমানী সে মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যাবেলা ঘরের দাওয়ায় বসিয়া হিমানী ভাবিতে ছিল, তাহার এই জীবনের কথা। কত ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতই তাহার জীবনের উপর দিয়া বহিয়াছে, সে কাঁদিয়াছে, পড়িয়াছে আবার কূলও পাইয়াছে, কিন্তু এবারকার এ আশ্রয় কোন সাগরের তীরে, সে কি করিয়া ঐ মলিন সুন্দর করিয়া লইবে? এ যে পিপাসার রাজত্ব। অর্থের রাজত্ব! হিমানীর ত এখানে কোন সাধ্য নাই। এমন সময় ক্ষীরোদা সেখানে প্রবেশ করিয়া কহিল,—"ভাবছিস্ বুঝি হিমানী? আহা ভাব্‌বার কথাই বটে ভাই। জন্মভোর

কাকে চাইলি আর কাকে পেলি!" হিমানী তীব্র দৃষ্টিতে ক্ষীরোদার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল তাহার কথার কোন অর্থ করিতে পারিল না! ক্ষীরোদা কহিল,—যদি বলিস্ ভাই তাহ'লে একবার দেখা করিয়েও দিতে পারি।

হিমানী কহিল,—কার কথা ব'লছো তুমি ক্ষীরোদা?

ক্ষীরোদা নিচুস্বরে কহিল,—যাকে দিবারাত্র অন্তরে ধ্যান করো; তা ভাই সে ধ্যান করবার জিনিষই বটে, একবারে দেবতা; আমারও যেন ইচ্ছে করে ....

হিমানী। তোমরা ত একসঙ্গে এতদিন কাটিয়ে এলে!

ক্ষীরোদা। ও পাগল। তোমার স্বামিটি নয়, নরেন-বাবু; এইবার বুঝেছ।

হিমানী মুখ ফিরাইয়াই ছিল নরেনবাবুর নাম শুনিয়া মুখটা ফিরাইয়া কহিল (সে জানিত নরেনদা হয়ত এখন এখানে নাই।) নরেনদা কি এখনও এখানে আছেন?

ক্ষীরোদা কহিল—আছেন বৈকি, গ্রামেও সকালে একবার এসেছিলেন। বাপের বিষয় সম্পত্তির সমস্ত আয় স্কুল পাঠশালায় লাগিয়ে দিলেন!

হিমানী। আমি যে একবার ডেকেছিলাম তাঁকে; কেন এলেন না কে জানে, কয়টা কথা তাঁকে বলবার ছিল!

'বলেই ফেল না গো' বলিতে বলিতে শশিভূষণ সেখানে

প্রবেশ করিয়া ক্ষীরোদার দিকে চাহিয়া কহিল,—তোমরা যে বলো হিমানী বেশ্যারও অধম, আমি নিজ মুখেই তার সে কথা শুনে তা বিশ্বাস ক'রেছি। কুমারী অবস্থায় হিন্দু নারীর কত জনের সঙ্গেই বিবাহের কথাবার্ত্তা হয়, কিন্তু তাই ব'লে এমন ভাবে বিবাহের পরও স্বামীর চিন্তা স্বামীর সংসর্গ ত্যাগ করে, আর একজনকে সর্ব্বদাই অন্তরে ভাবা, নিশ্চয়ই সে পাপের সীমা নাই।

হিমানী ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল,—এ কথা তোমায় কে বুঝাইয়া দিল ?

শশীও অগ্নিশর্ম্মা হইয়া কহিল,—কেন তুমি নিজেই—আমি কি শুনি নাই মনে ক'রেছ ?

হিমানী দৃঢ়স্বরে কহিল,—দেখ আমি আর যাই হই, হাজার মূর্খ মেয়ে মানুষই হই—তবু চরিত্রের মর্য্যাদা বুঝি, তোমাদের মত সেটাকে কথার কথা ব'লে গণ্য করি না !

শশী দৃঢ় হস্তে হিমানীর হাত চাপিয়া কহিল,—থামো পণ্ডিতজী। ক্ষীরোদা বউঠাকুরুণ যে সাক্ষ্য দিবে।

হিমানী কহিল,—আচ্ছা বলুক ! আমি কি ব'লেছি।

ক্ষীরোদা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—হিমানী এমন ত কিছু বেশী কথা বলেনি, সে ব'ল্‌লে যে নরেন বাবুকে এখনও সে ভুল্‌তে পারে নি।

শশী হিমানীকে একটা ঝাঁকুনী দিয়া কহিল,—এর পরে আরও প্রমাণ চাও ?

হিমানী কহিল,—আচ্ছা শাস্তি দাও। কিন্তু তবু জেনে রেখো আমি সতী, বিবাহের পর দিন হ'তে তোমাকেই আমার স্বামী ব'লে জানি, নরেন্দ্র আমার ভাই ছাড়া কেউ নয়।

শশী। ধরা প'ড়লে অমন সকল মেয়ে মানুষই ঐ রকম মিথ্যা অজুহাত দর্শায়। তোমায় কি শাস্তি দেব তা এখনও মনে ক'রে উঠতে পারছি না। তোমায় দণ্ডে দণ্ডে মেরে ফেল্‌বো ! পৃথিবীর কণ্টক শূন্য হবে।

হিমানী কহিল,—তাই মেরে ফেলো। আমি জান্‌বো আমার আরাধ্যের হাতে ম'রে ধন্য হ'য়েছি !

শশী কহিল,—ক্ষীরোদা বউঠাকরুণ আলো ধরত, এই রাত্রেই হিমানীকে শ্মশানঘাটে সেই সন্ন্যাসীর কাছে স্বামীর বশীভূত থাকবার ঔষধটা খাইয়ে আনতে হবে।

ক্ষীরোদা কহিল,—এখুনি চলো, আমিও শুদ্ধ সঙ্গে যাচ্চি।

হিমানী দু বার যাইতে আপত্তি করিল। কিন্তু তাহা-দের জোরের সহিত পারিল না, বাধ্য হইয়াই তাহাকে চলিতে হইল। বাড়ীর বাহির হইয়াই ভাবিল যদি সন্ন্যাসীর

কাছে একটা ঔষধ খাইয়া আসিলেই তাহাদের তৃপ্তি হয় তাই হউক। সেই জন্য আর তাহার শাশুড়ীকেও ডাকিল না। আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল মেঘের ফাঁক হইতে একটা নক্ষত্র তাহাকে যেন কি বলিয়া আবার পরক্ষণেই মেঘের মধ্যেই অন্তর্হিত হইয়া গেল। হিমানীর বুকটা দুর দুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। পৃথিবীর দিকে চাহিয়া দেখিল চারিদিকে কি অন্ধকারের ঘনঘটা! একটা যেন কৃষ্ণ সমুদ্র ফাঁপিয়া উঠিয়া সমস্ত জগত খানিকেই গ্রাস করিবার আয়োজনে আছে। একটা দীর্ঘশ্বাস বুকে উঠিয়া বুকেই মিলাইয়া গেল।

ক্ষীরোদা ও শশীর অন্ধকারের দিকে চাহিয়া বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপই নাই। বরং তাহাদের যেন উৎসাহ বাড়িয়াই উঠিতেছে। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে কিন্তু তাহাদের এমন ভাব ছিল না। অনেক দিন আগে ক্ষীরোদার সহিত শশী ঐ বিষয়ের ঐ রকম হিমানীর স্বামীর বশীভূত থাকিবার একটা কল্পনা করিয়াছিল বটে তাহার জন্য সন্ন্যাসীকে বলিয়াও আসিয়াছিল। কিন্তু কার্য্যে পরিণত করিবার অবসর ঘটিয়া উঠে নাই। হিমানীকে লইয়া আজ তাহাদের কেমন একটা রক্তের মত নেশা জাগিয়া উঠিল। শশী ক্ষীরোদার দিকে একটা কটাক্ষপাত করিয়া

কহিল,—ভাগ্যিস নরেনবাবুকে আজ আসতে বারণ ক'রে এসেছিলাম, নইলে ওকি ঘরে থাকতো, আজই চলে যেতো ; নরেনও সেইজন্য আর কলকাতা যেতে চায় না, শুন্‌ছি সেই বিবিটাকে শুদ্ধ নিয়ে এসে নিজের সম্পত্তিতে স্বামী হ'য়ে ব'সবেন !

ক্ষীরোদা কহিল,—বল কি ? বিধবার সঙ্গে একেবারে স্বামিস্ত্রীর মত ঘরকন্না চ'ল্‌বে ?

শশী কহিল—চলবে বৈকি। তবে বাইরে তাদের ভড়ংটা বেশী কিনা। লোকের চোখে ধূলো দিতে পার্‌বে শুনলাম বিধবাটি নাকি গ্রামের বাড়ীতে বাড়ীতে লেখা পড়া শিক্ষা দিয়ে ফিরবে ! এই রকম মতলব হ'য়েছে। নামে ব্রতধারী আর ব্রতধারিণী। আর খোদ কর্ত্তার ত চাল অনেক রকমই আছে।

ক্ষীরোদা কহিল,—কালে কালে কতই শুন্‌তে হ'বে। হিমানীও সব শুনিতেছিল কিন্তু তাহার আর কোন কথার উত্তর দিবার সামর্থ্যে কুলাইতে ছিল না !

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

সন্ন্যাসীটি আগে ছুতার মিস্ত্রীর কাজ কবিতেন, এবং নিজেও জাতি হিসাবে সূত্রধরই ছিলেন। কিছুদিন হইতে যেই তাঁহাব ব্যবসায় মন্দা পড়িতে লাগিল এবং ঘরেও পুষ্যি বাড়িতে থাকিল অমনি অসার সংসারের মায়া কাটাইয়া সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। সেই বিষয়ে তাঁহার উপদেষ্টাও জুটিয়াছিল ভাল। তাঁহারই মত এক মহাপ্রভু যতদিন পারিলেন দেনা করিয়া সংসার বিষয় আশয় চালাইয়া তার পর নিজের পরিবারটিকে হঠাৎ একদিন বিপদের পাথারের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া গাঁজা ও সিদ্ধি লইয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়া পড়িলেন। কাজেই যোগ্যে যোগ্যে যখন মিলন হইয়া গেল, তখন সন্ন্যাসী হইয়াও নিজের উদরান্নের সংস্থান করিবার সহজ পথগুলিও ত্যাগ করিলেন না। জারণ ও মারণ ঘটিত ঔষধগুলি তাঁহারা আয়ত্ব করিয়া লইয়া এক এক আড্ডায় আশ্রয় লইয়া ফেলিলেন। ভরসা আছে উভয়কেই আর অধিক দিন এ আশ্রমে থাকিতে হইবে না। হাতে কিছু মিলিলেই আবার আপন আপন ঘরে গিয়া উঠিবেন।

· শশিভূষণের সহিত আগেই দরদস্তুর ঠিক হইয়া গিয়া-

ছিল। রোগিণী আসিতেই সন্ন্যাসী দেবতা আড়াইটি গোলমরিচের সহিত একটা ঔষধ রোগিণীকে চিবাইয়া খাইয়া ফেলিতে বলিলে হিমানী তাহাতে আপত্তি করিল। সন্ন্যাসী কহিলেন, খাইতেই হইবে। ঔষধ খাওয়াইবার পর সন্ন্যাসী তখন শশিভূষণকে ইঙ্গিত করিল। শশিভূষণ একটু ভীত হইয়া সন্ন্যাসীকে কহিল,—তা'হলে মারা যাবেনা ত?

সন্ন্যাসী কহিল,—তেমন স্থির বিশ্বাস ত কিছুই নাই, তবে এ গোক্ষুরার বিষ, যদি রোগ থাকে সেরে যাবে, আর যদি কপটতা হয় মর্‌তে হবে। কিন্তু এ বিষে বেঁচে থাকলে তাকে স্বামীর বশে থাক্‌তেই হবে।

শশিভূষণ কহিল,—তা'হলে উইলটা এখুনি তার কাছ হতে হাত করে নিতে হবে ত?

সন্ন্যাসী কহিলেন, সে ত আপনাকে সব খুলেই ব'লে-ছিলাম। যদি বিষয় চান, তা'হলে এই রকম আয়োজনটু ক'রতে হবে। আপনিও ত তাই স্বীকার করে গিয়েছিলেন, নইলে আমারও কি সাধ একটা মহাপ্রাণীকে—সে কেবল আপনার উপকার হবে বলেই।

শশী কহিল,—হাঁ তা বুঝেছি, এখন দোয়াত কলমটা বের ক'রে আপনিও শুদ্ধ কাছে এসে দাঁড়ান।

সন্ন্যাসী কহিল,—তিন দিন পর্যান্ত তার জীবনের কোন হানি হবে না, এ বলে রাখছি, তবে উইলটা সেরে নিতে পারেন।

শশিভূষণ হিমানীর কাছে আসিয়া কহিল,—দেখ হিমানী, তোমাকে একটা উইল লিখে দিতে হবে, তোমার যা বিষয় লাভ হ'য়েছে সেটা আমার নামে। ....

হিমানী কহিল,—আমার বিষয়, আবার তার লিখ্‌বো কি, সেত তুমিই পাবে।

শশী। সে পাবো যদিও, তথাপি—

হিমানী। তথাপি—আমার অন্তিম কি ঘনিয়ে এসেছে? তাহার মাথাটা কেমন ঘুরিয়া উঠিল।

শশী কহিল,—বলাই বা যায় কি ক'রে, মরণের ত আর সময় অসময় নাই।

হিমানী। তবে কি আমায় শুধু উইল লেখাবার জন্যই সন্ন্যাসীর কাছে গ্রেপ্তার করে এনেছিলে? আর সেই জন্যই বিষ খাইয়ে দিলে?—কিন্তু কোন দরকার ছিল না!—ওঃ—শশিভূষণ হিমানীর হাতে একটা কলম দিয়া কহিল, লেখো। আমার সমস্ত সম্পত্তি আমার স্বামী শশিভূষণকে উইল করিয়া দিলাম, ইহাতে আর কাহারও কোন স্বত্ত রহিল না।—লেখ।—

হিমানী একবার করুণ নয়নে নিজের স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিল,—আচ্ছা লিখে দিচ্ছি, বলিয়া কম্পিত হস্তে লিখিয়া দিয়া কহিল, আমায় এত জুলুম না ক'রলেও ত লিখে দিতে পারতাম, বলিয়া কাগজ খানা শশিভূষণের হস্তে দিল। শশিভূষণ সেটা প্রদীপের ক্ষীণ আলোকের কাছে তুলিয়া ধরিয়া তীব্র দৃষ্টিতে পড়িয়া লইয়া পকেটে রাখিয়া দিল। উইলের লেখাগুলা যেন তাহার ভাবি ঐশ্বর্য্যের পাহারাদারদের মত, তাহার জীবনপথের কূলে কূলে সুবর্ণের মরীচিকা আঁকিয়া যাইতে লাগিল—লেখার সময় ক্ষীরোদা বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল; ঘরে আসিয়া কহিল,—কাজ শেষ যদি হ'য়ে থাকে তবে এইবার সব বেরিয়ে পড়। শশী সন্ন্যাসীকে প্রণাম ও নজর দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। আকাশে তখন এত অন্ধকার যে কোলের মানুষই নজর হয় না—শশী ক্ষীরোদাকে টানিয়া কহিল,—তুমি হিমানীর একটা হাত ধরো।

ক্ষীরোদা কহিল,—সন্ন্যাসী ঠাকুর ওষুধের বেশ কাজ হবে ব'ল্‌লে ত!"

শশী অন্ধকারে ক্ষীরোদার একটু গা টিপিয়া কহিল, নিশ্চয়ই, কাজ নইলে আস্‌বো কেন?

তাহার এই পৈশাচিক আনন্দটা অন্ধকারেরই মত

নরকের একটা বিভীষিকা বহিয়া তাহাকে ক্রমাগত গভীর এক খাতের ধারে টানিয়া লইয়া যাইতে ছিল। শশীর কিন্তু সে খতের ভাবনা ভাবিয়া একটু ভয় হইতেছিল না, তাহার চক্ষে ঐশ্বর্য্যের দীপ্তিটাই সর্ব্বাপেক্ষা মোহন বেশে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সহসা কিসের স্পর্শে চকিত হইয়া ক্ষীরোদা লাফাইয়া উঠিল। হিমানীর কোনদিকেই লক্ষ্য ছিল না; তাহার সম্মুখেও যেমন অন্ধকার পশ্চাতেও তেমন অন্ধকার।

শশী কহিল,—ক্ষীরোদা তুমি চম্‌কে উঠ্‌লে কেন ?—

ক্ষীরোদা কহিল,—যেন কাকে স্পর্শ করলাম।

শশী কহিল,—ওটা আতঙ্ক! নির্ভয়ে চলো!—

ক্ষীরোদা কহিল,—এ রাস্তাও ত ভাল নয়। কোন মরা মানুষ হ'তে পারে।

তাহাদের চক্ষের সম্মুখে একটা তীব্র আলোক প্রকাশিত হইয়া গেল!

ক্ষীরোদার মনে হইল যেন এটা নিশাচর প্রেতের একটা দীপ্তি। শশীরও নরকের আলো বলিয়া ভয় হইয়াছিল। কিন্তু সে হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, ওটা আলেয়ার—আলো—

দ্রুতপদক্ষেপে তাহারা হিমানীকে টানিয়া লইয়া যাইতে

লাগিল। নরেন্দ্র আর আপনাকে গোপন রাখিল না,· আপনার বিদ্যুৎ আলোটা প্রকাশ করিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল,—এতরাত্রে তোমরা কোথায় গিয়েছিলে শশীবাবু?

শশীর মনে হইল যেন পাতাল ফুঁড়িয়া দেবদূতেরা তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। ক্ষীরোদার শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। প্রথমটা শশী চিনিতে পারে নাই, তার পর যেই বুঝিল নরেন্দ্র, অমনি কহিল,—আমরা এই শ্মশান পথেই গিয়েছিলাম নরেন্দ্রবাবু, এখন ফির্‌ছি। আপনি এত রাত্রে কোথা হ'তে নরেন্দ্রবাবু?

নরেন্দ্র কহিল,—বন্যার পর হ'তে আমাদের সারারাত গ্রামের পাশে পাশে চোরা আলো নিয়ে পাহারা দিতে হয়। দেশে একবারে খাদ্যাভাব হ'য়েছে কি না, কে কার কষ্ট-সঞ্চিত খাদ্য অপহরণ করে তার ঠিকানা নাই।

শশী কহিল,—তোমরাই ঠিক কাজ ক'চ্ছ নরেন্দ্র বাবু।

নরেন্দ্র কহিল,—সঙ্গে হিমানীও যে।

শশী কহিল,—ঐ হিমানীর জন্যই ত শ্মশানের সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে গিয়ে ছিলাম, আপনাকে ওবেলায় বল্লুম না, তার জ্বর আর ছাড়্‌ছে না, তাই একটা দৈব ঔষধ দিয়ে পরীক্ষা করতে মন হলো, আর চিকিৎসকও মেলা

দায়, বন্যার পর হ'তে হিমানীকে নিয়ে একদণ্ড সোয়াস্তি নাই, সন্ন্যাসী ঠাকুরটির ওষুধও খুব ভালো।

নরেন্দ্র কহিল,—সঙ্গে একটা আলো রাখার ত অবশ্য প্রয়োজন ছিল।

শশী কহিল,—সঙ্গে মেয়েছেলে র'য়েছে, পরিচিতদের চোখে প'ড়্বো বলে আলো নিই নি।

নরেন্দ্র কহিল,—তাহ'লে হিমানীর খুব জ্বর। আমি ওর সঙ্গে ভাই ফোঁটার দিন সাক্ষাৎ ক'র্বো মনে ক'রে-ছিলাম।

শশী কহিল,—সে ত আপনি ও বেলায় বল্লেন; বেজায় জ্বর, এই দেখুন না, হুঁসও নাই।

নরেন্দ্র হাতের আলোটি তুলিয়া ধরিয়া ডাকিল, 'হিমানী! হিমানী! চিনতে পারো?

হিমানী শিব নেত্রে চাহিয়া কহিল,—আমি চিনতে পাচ্ছি দাদা। ও আমার অনেক দিনকার পরিচিত কণ্ঠস্বর। কিন্তু চোখ খুলে দেখবার সামর্থ্যে কুলচ্ছে না।—বিষ কি মানুষে হজম্ ক'র্তে পারে?

নরেন্দ্র কহিল,—বিষ কি হিমানী!

শশী কহিল,—বুঝেছেন না, বিকারের ঘোর। কেবল বলছে বিষ দিলে, বিষ দিলে।

হিমানী কহিল,—চুপ কর। যতই চেপে রাখতে চাও, তোমরা ষড়যন্ত্র করে আমায় বিষই খাইয়েছো। সেই ঘাতক সন্ন্যাসী আমায় বিষ দিয়েছে। নইলে এমন হ'চ্ছে কেন, ওষুধ খাবার আগে ত এমন ছিল না। নরেন দাদা, নরেন দাদা, এরা আমার বিষয়ের লোভে আমায় বিষ দিয়েছে, জোর ক'রে আমার কাছ হ'তে উইল লিখিয়ে নিয়েছে।

নরেন্দ্র কহিল,—একি বলে হিমানী, শশীবাবু?

শশী কহিল,—বল্লুম না বিকারের প্রলাপ।

হিমানী কহিল,—নরেন দা এখনও আমার স্বামীর পকেটে হাত দিয়ে দেখ—উইল প'ড়ে আছে, ওঃ—মৃত্যুর এমন যন্ত্রণা।—আর এই যন্ত্রণা দিয়ে মানুষ মানুষের কাছে অর্থ আদায় করে—

নরেন্দ্র তাহার সঙ্কেত বাঁশি বাজাইল, বাঁশি বাজাইতেই প্রায় সাতজন সেবাব্রতধারী আলো হাতে করিয়া নরেন্দ্রের পার্শ্বে দাঁড়াইল। নরেন্দ্র আপন সঙ্গীদের কহিল,—একটা ভয়ানক কিছু ঘটেছে, তোমরা অপেক্ষা করো, হয় ত পুলিশ ডাকবার প্রয়োজন হ'তে পারে—

শশী কহিল,—নরেনবাবু আপনি পাগল হলেন কি!—এটা অপনাদের বিশ্বাস হয় যে আমি বিষ দিয়ে আমার

স্ত্রীকে হত্যা করিয়ে তারপর সেই স্ত্রীর পরিত্যক্ত বিষয় ভোগ করবো?—একি সম্ভব!

ক্ষীরোদা ভয়ে কাঁপিতেছিল।—সে ভাবিতেছিল এত রাত্রে সে যে শশীর সহযাত্রী হইয়াছিল তাহাই একটা কলঙ্কের বিষয়, তাহাব উপর যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা ত তাহার অবিদিত নাই।

অন্ধকার রজনী যেন পাথরের মত তাহার বুকেব উপর চাপিয়া বসিল। উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল একটা নক্ষত্রও নাই। বাতাস রহিয়া রহিয়া গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া ছুটিয়া আসিতেছে প্রান্তরের বৃক্ষশ্রেণীর উপরে সে শব্দ কি ভয়ঙ্কর।

নরেন্দ্র কহিল,—আমারও কেমন সন্দেহ হ'চ্ছে, এমন ব্যারাম অবস্থায় রোগিণীকে নিয়ে কেউ শ্মশান ঘাটের সন্ন্যাসীর কাছে ঔষধের জন্য যেতে পারে?

হিমানী কহিল,—দাদা মার সঙ্গে দেখা হয় ত ব'লো, তোমার হিমানী, যাকে সোণার মরুভূমিতে নিক্ষেপ ক'রে গিয়েছিলে, সেই সোণাই তার মরণ ঘটালে, সত্যকার মরুভূমি হ'লে হয় ত বেঁচে থাকতে পারতাম! কিন্তু এই স্বর্ণ-মরু সে যে আরও তপ্ত, আরও উষ্ণ। নরেন্দ্র তাহার জনৈক বিশেষজ্ঞ বন্ধুকে প্রকৃতই হিমানীর পরে বিষ

প্রয়োগ হইয়াছে কিনা তাহার পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করিল। এবং নিজে শশীর গায়ের জামার পকেট কয়টা দেখিতে চাহিল। শশী কহিল—সাবধান নরেন্দ্রবাবু; আইন বাঁচিয়ে চল্‌তে হয় মনে রাখবেন।

নরেন্দ্র কহিল,—শশিভূষণ, আইন দুর্ব্বলের জন্য, যে সবল তার আবার আইনের প্রয়োজন কোন কালে? বলিয়া জোর করিয়া শশিভূষণের পকেট দেখিতে লাগিল। এমন সময় ক্ষীরোদা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—ওগো সত্যই সবই সত্য। হিমানীকে বিষ খাওয়ান সত্য, আর উইল লেখাও সত্য।

এক সঙ্গে যেমন হাজার সাপের ফণা দেখিলে মানুষ শিহরিয়া উঠে, নরেন্দ্র তেমনি শিহরিয়া উঠিল। একজন সঙ্গীর প্রতি এই বিধবা ক্ষীরোদাকেও আগলাইতে আদেশ করিল।

নরেন্দ্রের বিশেজ্ঞ বন্ধুটি কহিল,—এযে বিষ দেওয়াই দেখা যাচ্ছে।

নরেন্দ্র থানায় খবর পাঠাইতে ও সন্ন্যাসীটিকেও গ্রেপ্তার করিতে বলিয়া হিমানীকে বাড়ী লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

শশী নরেন্দ্রের বাড়ী যাইতে অস্বীকার করিতেছিল,

নরেন্দ্র বজ্রমুষ্টিতে শশীকে চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—যাইতেই হইবে

অনেক রাত্রির পর হিমানী একটা ঘোর হইতে জাগিয়া ডাকিল, দাদা।

নরেন্দ্র কহিল, কি হিমানী? হিমানী নরেন্দ্রের একটা হাত চাপিয়া কহিল, দাদা পুলিশে খবর দিও না, সে অনেক হাঙ্গাম, হাজার হোক তবু তিনি আমার স্বামীতো। শশী তখন ফ্যাল ফ্যাল করিয়া কেবল হিমানীর দিকে চাহিতে ছিল, সে যে কি করিয়া ফেলিয়াচে, তাহা ঠিক তাহার ধারণায় আনিতে পারিতেছিল না। সে ভাবিতেছিল পুলিশের কাছে উল্টা এজেহারই দিবে! সন্ন্যাসী তাহাকে বিষ দিয়াছে, তাহার জন্য কে দায়ী? আমিত আমার স্ত্রীকে ঔষধ খাওয়াইতেই গিয়াছিলাম।

নরেন্দ্র কহিল,—এমন লোককে তোমার স্বামী ব'ল্‌তে একটুও ঘৃণাও হ'চ্ছে না।

হিমানী কহিল,—না দাদা তিনি যে আমার ইহকাল পরকালের উপাস্য। বিবাহের পরদিন হ'তে কেবল যে তাঁর সুখদুঃখ আমায় ভাবতে হ'য়েছে।

নরেন্দ্র কহিল—আর তোমার তার সঙ্গে কি সম্পর্ক?

তোমাকে ত তিনি এগিয়েই দিয়েছেন, হত্যাকারীর শাস্তি-টাও বাদ থাকে কেন ?

হিমানী কহিল,—না দাদা ভগবান আছেন। শাস্তি পুরস্কারের কর্ত্তাই যে তিনি, তুমি আমি কে—দাদা বেঁচে থাকতে দাও। ভোগ করুন, ভাবছো এই বিষয় সম্পত্তি নিয়ে তিনি সুখে থাকবেন। কিছুই মুখে রুচবে না। আপনি সব জ্বলে উঠবে। তখন দেখো কি প্রায়শ্চিত্ত !

নরেন্দ্র চীৎকার করিয়া কহিল,—শশী এমন নিরপ-রাধাকেও তুমি বিষ খাইয়েছ। তোমার পাপের সীমা নাই।

শশী কহিতে লাগিল আমার কি দোষ তাই বলুন। সন্ন্যাসীর ওষুধে যদি কিছু থাকে—

নরেন্দ্র কহিল,—চুপ, সাক্ষী অনেক আছে। এখন পার ত একবার ক্ষমা চেয়ে নাও, তোমার অনন্ত নরক যন্ত্রণার যদি কিছুও উপশম হয়।

শশী তখন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া গিয়াছিল আপনাকে সাম-লাইয়া লইবারও আর কোন উপায় দেখিতেছিল না। অথচ আপনাকে বাঁচাইবার চেষ্টাও তার বড় প্রবল, কহিল —আমি ক্ষমা চাইছি, ক্ষমা চাইছি।

ভোরের দিকে হিমানী আর একবার ডাকিল, দাদা।

নরেন্দ্র কহিল,—কি হিমানী।

হিমানী নরেন্দ্রের পায়ে হাত চাপিয়া কহিল, ভাই-ফোঁটা আর এজীবনে হ'ল না দাদা। আশীর্ব্বাদ করুন, জন্মান্তরে যেন ফোঁটা দিয়ে ধন্য হই।

নরেন্দ্রের চোখ দিয়া একটা উষ্ণ অশ্রুর স্রোত বহিয়া গেল। সে ভাবিতেছিল, সে না বিবাগী হইলে হয় ত আজ হিমানীকে শুকাইতে হইত না। তাহার বক্ষে দ্রুত রক্তস্রোত বহিয়া যাইতে লাগিল।

হিমানী কহিল,—ঘর ছেড়ে আর বাইরে যেও না দাদা, দেখ্‌লে ত, বাইরে যা কুড়িয়েছ ঘরে তার চেয়ে কত বেশী; ঘরে তোমার এত জঞ্জাল যে জীবনভোর খাটলেও তার শেষ ক'র্‌তে পারবে না। এইমূর্খতা অন্ধতার মাঝখানেই তোমার আসন স্থায়ী ক'রো দাদা। ভবিষ্যতের অনেক হিমানী হয় ত তাতে বেঁচে যাবে।

নরেন্দ্র কহিল,—সেই ঠিক ক'রেই ত এখানে এসেছিলাম হিমানী, কিন্তু চ'লে যাচ্ছিস তুই, তাই আপনি একটা কান্না আস্‌ছে, ভাবছি সংসারে কেবল এলি আর চ'লে গেলি।

সারারাত শুশ্রূষা করিয়াও যখন হিমানীকে বাঁচাইতে

পারা গেল না, তখন বাধ্য হইয়া নরেন্দ্রনাথকে তাহার সংকারের আয়োজন করিতে হইল। ক্ষীরোদা এতক্ষণ একপার্শ্বেই পড়িয়াছিল, সে নীরবে হিমানীর দিকে চাহিয়া তাহার মরণদৃশ্য দেখিতেছিল। যখন সে দেখিল হাজার লোকের ধিক্কারে ধিক্কারে আকাশ পর্য্যন্ত কালিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তখন সে আর থাকিতে পারিল না। সমস্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া দিয়া কহিল,—এর জন্য শশীবাবুই শুধু একা দায়ী নহেন। আমিই আমার পথের কাঁটা তুলতে শশীবাবুকে উত্তেজিত করিয়াছিলাম, আর শশী বাবুও পাপীয়সীর কথায় ভুলে গিয়েছিলেন, তিনি দেখতে পান নি যে আমার ভিতরে কি ষড়যন্ত্রই চলছে। তিনিও উইলটুকু লেখাবার জন্য—বলিতে বলিতে হু হু করিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। নরেন্দ্রনাথের পা জড়াইয়া ধরিয়া ধরিয়া কহিল, আমি সতী সাধ্বীকে সংসার হ'তে তাড়িয়েছি। আমার পাপের শাস্তি হোক,—আমার পুলিশে দিয়ে দিন। আমার বেঁচে থাকবার আর কি প্রয়োজন?

নরেন্দ্র একবার ঘৃণার দৃষ্টিতে ক্ষীরোদার পানে চাহিয়া কহিল,—চুপ কর শয়তানী, তোর হাহাকারে হয়ত সে পরকালেও শান্ত হ'তে পারবে না। তোদের

উৎসর্গ

হয়বৎনগরের

সুপ্রসিদ্ধ প্রজারঞ্জক ভূম্যধিকারী

সাহিত্য-সুহৃদ্

মসনদ আলি

দেওয়ান আলিম দাদখান

মহোদয়ের

করকমলে

এই গ্রন্থখানি

অর্পণ করিয়া

কৃতার্থ হইলাম।

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশ্রীনারায়ণের কৃপায় আট আনা সংস্করণের ৪র্থ গ্রন্থ 'স্বর্ণ-মরু" প্রকাশিত হইল। সুলভে সৎসাহিত্যের প্রচারোদ্দেশ্যে—এই কাগজের মহার্ঘতার দিনে ক্ষুদ্রশক্তি আমরা—এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম—তখন বুঝিতে পারি নাই—আমরা ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিব কি না,—এখন শ্রীশ্রীনারায়ণের কৃপা ও সাহিত্য-সুহৃদের স্নেহদৃষ্টি এতদুভয়ই এই 'সিরিজে'র অক্ষয় কবচ স্বরূপ হইয়াছে।

পরিশেষে সাহিত্যানুরাগি-মহোদয়গণের নিকট সানুনয় প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা যেন এই 'সিরিজে'র নির্দ্দিষ্ট গ্রাহক হইয়া সৎ-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করেন। কাহাকেও অগ্রিম মূল্য দিতে হইবে না, মাত্র পত্র লিখিয়া গ্রাহক হইলে যে কয়খানি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাইব এবং যখন যেখানি প্রকাশিত হইবে তখনই সেই খানি পাঠাইব। আমাদের প্রত্যেক পুস্তকই মূল্যবান কাগজে উৎকৃষ্ট ছাপা, মনোহর বাঁধা এবং আর্ট কাগজে ছাপা সুন্দর হাফটোন ছবিযুক্ত।

এবারও বিশেষ কারণ বশতঃ সুলেখক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাল মহাশয়ের মনোমোহকর উপন্যাস "সমাজ-বিপ্লব" ৫ম গ্রন্থ না হইয়া সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম, এ প্রণীত হৃদয়দ্রবকারী উপন্যাস "দাদার ঘরে" সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া ৫ম গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। "দাদার ঘরে" বৈশাখ মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে। "সমাজ-বিপ্লব" জ্যৈষ্ঠের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে। ইতি।

রামনবমী,
১৩২৩ সাল।

আমাদের ।।০ আনা সংস্করণের

প্রকাশিত গ্রন্থাবলী—

১ম। শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ প্রণীত

শুভ-দৃষ্টি

২য়। শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র বসু বি, এস, সি প্রণীত

রবিদাদা

৩য়। শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ বি, এ প্রণীত

ইন্দু

৪র্থ। শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ প্রণীত

স্বর্ণ-মরু

৫ম। শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম, এ, প্রণীত

দাদার ঘরে

(যন্ত্রস্থ)

৬ষ্ঠ। শ্রীযতীন্দ্র নাথ পাল প্রণীত

সমাজ-বিপ্লব

(যন্ত্রস্থ)

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

দুজনকে একই শূলে চড়াতে হবে। শশী ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত কা[illegible]

নরেন্দ্র তাহার সঙ্গীদের কহিল, বন্ধুগণ বেঁচে থাকতে যে বঞ্চিত হ'য়েছে, মৃত্যুর পরও তাকে ফাঁকি দিলে চল্‌বে না। নিয়ে এস পুষ্প আভরণ, মৃত্যুতেও সে যে অনন্ত মহত্ত্ব রেখে গেছে, আমাদের চক্ষের জলে আর শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলিতে তার স্বর্গের পথ প্রশস্ত করি।

সমাপ্ত।